ধরা-বাঁধা জীবন

মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়

বিরচিত

ধরাবাঁধা জীবন প্রথম সংস্করণের প্রচ্ছদ

এক

একদিনে ভূপেনের বউ আর ছেলে মরিয়া গেল, কিন্তু ভূপেন কাঁদিল না। প্রথমে মরিল তার বউ, কয়েক ঘণ্টা পরে ছেলেটা।

ভূপেনের আর ছেলেমেয়ে নাই। বছর দুয়েক বয়স হইয়াছিল ছেলেটার। মাসখানেক আগে তার টাইফয়েড হয়। ছেলের সামান্য কিছু হইলেই ভূপেনের বউ বড়ো অস্থির হইয়া পড়িত। ভাবিয়া ভাবিয়া এবং কারও বারণ না মানিয়া দিনরাত ছেলের সেবা করিয়া সে বড়োই কাবু হইয়া পড়িয়াছিল। আরও বড়ো একটা কারণ ছিল তার কাবু হইয়া পড়ার। মারা সে গেল সেই কারণটির শেষ ধাক্কায়—মরা একটা মেয়েকে জন্ম দিতে গিয়া।

প্রথম মরণটা যখন ঘটে, ভূপেন আনমনে একটা সিগারেট ধরাইয়া মেয়েদের কান্নার শব্দ কানে আসামাত্র আধপোড়া সিগারেটটা ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়াছিল। ছেলের মরার সময়ও সে তেমনই আনমনে একটা সিগারেট ধরাইল এবং মেয়েদের কান্নার শব্দ নূতন আবেগে উচ্ছ্বসিত হইয়া ওঠামাত্র আবার সিগারেটটা ফেলিয়া দিল।

বন্ধু ও প্রতিবেশী ভদ্রলোকেরা আসিয়াছিল। ভূপেনের বউ মারা গেলে তারা ভাবিল, ছেলের ভাবনায় শোক মানুষটার চাপা পড়িয়া গিয়াছে, সে পরে কাঁদিবে, ছেলের একটা কিছু হইয়া গেলে। ছেলেটা মারা যাওয়ার পর তারা ভাবিল, পরপর দুটি দুর্ঘটনায় মানুষটার ধাঁধা লাগিয়া গিয়াছে, খতোমতো ভাবটা কাটিয়া গেলেই সে পাগলের মতো মাথা-কপাল কুটিয়া কাঁদাকাটা করিতে থাকিবে।

কিন্তু অল্পে অল্পে সময় কাটিয়া গেল, দেহ দুটিকে শ্মশানে নেওয়ার আয়োজন প্রায় সম্পূর্ণ হইয়া আসিল, ভূপেন কাঁদিল না। না কাঁদিলে যে সব পাগলামি করার রীতি আছে এ অবস্থায় সে রকম কোনো পাগলামিও করিল না। কেবল মুখখানা তার দেখাইতে লাগিল অস্বাভাবিক রকম বিবর্ণ। কদিন দাড়ি কামায় নাই, স্নান হয় নাই দু-তিনদিন, ভূপেনের মুখখানা এমনি শোকাতুর মানুষের মুখের মতো হইয়া গিয়াছিল। সকলে তাই আরও বেশি অস্বস্তির সঙ্গে ভাবিতে লাগিল, মুখে যার গভীর মর্মান্তিক শোকের এমন স্পষ্ট ছাপ পড়িয়াছে সে কাঁদে না কেন ?

দুটি মানুষ যে বাড়িতে মারা গিয়াছে সদ্যসদ্য, সে বাড়িতে অসাধারণ একটা অবস্থা সৃষ্টি হওয়াটাই স্বাভাবিক, সে জন্য কিছু আসিয়া যায় না, অস্বাভাবিক কিছু ঘটিলেই মানুষ পীড়া বোধ করে। ভূপেনের চুপচাপ থাকা ছাড়া এ বাড়িতে আর সব ঠিক মানানসই আছে। ভূপেনের মা আর পিসিমা চিৎকার করিয়া মরাকান্না কাঁদিতেছে, ভূপেনের দিদি বিমলার ঘণ্টায় ঘণ্টায় ফিট হইতেছে, ভূপেনের ছোটোবোন মেঝেতে বা দেয়ালে মাথা ঠুকিয়া ঠুকিয়া মাথা ফাটানোর চেষ্টা আরম্ভ করায় পাড়ার একটি বউ দুহাতে তাকে জড়াইয়া ধরিয়া আছে, ভূপেনের বউদিদি ভিতরের বারান্দায় দেয়ালের দিকে মুখ করিয়া গা এলাইয়া পড়িয়া আছে আর মৃদু ও মিহি গলায় গানের মতো সুর করিয়া কাঁদিতেছে, ভূপেনের দাদা পাগলের মতো একবার ভিতর ও একবার বাহির করিতে করিতে হায় হায় করিতেছে। আর শোকের এই সমস্ত প্রকাশ্য অভিব্যক্তির মধ্যে চলিতেছে মরণের পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থার আয়োজন।

কোমরে গামছা জড়াইয়া আট-দশজন উৎসাহী ও অভিজ্ঞ মানুষ জুটিয়া গিয়াছে। হরদম বিড়ি সিগারেট পুড়িতেছে ; বয়স্ক ভদ্রলোকদের মুখে নানারকম দার্শনিক মন্তব্য শোনা যাইতেছে : বাঁচা মরার উপর মানুষের নাকি কোনো হাত নাই, ভগবান কেন যে দেন আর কেন যে কাড়িয়া নেন তিনিই জানেন, যাইতে আমাদের সকলকেই হইবে, দুদিন আগে আর পরে।

এ সমস্তের মধ্যে ভূপেনের নিঃশব্দ শোক বড়োই খাপছাড়া মনে হইতে লাগিল। প্রসন্ন অভিজ্ঞ মানুষ। চিন্তিত মুখে সে আর একজন অভিজ্ঞ মানুষকে বলিল, এ তো ভালো কথা নয়, একটু কাঁদাকাটা করা যে দরকার !

ভাবিয়া চিন্তিয়া প্রসন্ন ভূপেনের কাছে গেল।

এমনি অদৃষ্ট ভাই মানুষের, সংসার করতে হলে সবাইকে এমনি করে কাঁদতে হয়, কী করবে বলো !

আমার এ কী সর্বনাশ হয়ে গেল প্রসন্নদা ? কেন আমার এমন হল প্রসন্নদা ?

কাঁদিতে কাঁদিতে মানুষ যেভাবে এ ধরনের কথা বলে অবিকল সেই রকম শোনাইল কথাগুলি। তবু বেশ বুঝা গেল ভূপেন কাঁদে নাই।

প্রসন্ন থাকে শহরের প্রায় অন্যপ্রান্তে। ভূপেনকে কাঁদাইতে না পাবিয়া সে হতাশ হইয়া বাড়ি ফিবিয়া গেল। পরদিন আসিল প্রসন্নের বোন প্রভা। বাড়িতে পা দিয়াই চোখ মুছিতে মুছিতে ধরা গলায় সে দাবি করিয়া বসিল, না না, এ রকম করবেন না ভূপেনবাবু, একটু আপনি কাঁদুন। কেন চেপে রাখছেন জোর করে ?

কাঁদব ?—ভূপেন কাঁদো কাঁদো হইয়া বলিল।

হ্যাঁ কাঁদুন। প্রাণ ভরে কেঁদে নিন। তাতে কোনো দোষ নেই। এ রকম অবস্থায় কাঁদা যে দবকাব—

নিজের কান্না বন্ধ করিতে প্রভাকে নিজের মুখে রুমাল গুঁজিযা দিতে হইল। এ তার লোক দেখানো কান্না নয়, পারিলে না কাঁদিয়াই ভূপেনের সঙ্গে দেখা করার কাজটা সে সারিয়া যাইত। ভূপেনকে কাঁদাইতে আসিয়া ভূমিকা করিতে গিয়া নিজেই সে এমনভাবে কাঁদিয়া ফেলিবে, তাব ধারণাও ছিল না। সমস্ত শরীর তার থরথব করিয়া কাঁপিতে থাকে আর দু-চোখ দিযা দরদব কবিয়া জল গড়াইয়া পড়ে। এতখানি ব্যাকুল হইয়া প্রভা নিজে না কাঁদিলে ভূপেন হযতো এখন কাঁদিয়া ফেলিতে পারিত, প্রভার বিকৃত মুখভঙ্গি দেখিতে দেখিতে তার মুখের এতক্ষণের কাঁদো কাঁদো ভাবটুকু পর্যন্ত ঘুচিয়া গেল।

দুবছর আগে প্রভা ডাক্তারি পাশ করিয়াছে। পাশ করার অনেক আগে হইতেই সে মাঝে মাঝে আসিয়া ভূপেনের বাড়ির ছেলেমেয়েদের চিকিৎসা কবিযা যাইত। মন তার কোনোদিন নরম ছিল না, ভাবপ্রবণতা তার নাই। মনে মনে ভূপেন বোধ হয় একটু ভয়ই তাকে করে। ভূপেন তাব প্রিয়জনের পর্যায়ে পড়ে সন্দেহ নাই, ভূপেনের বউ আর ছেলেটাকেও সে স্নেহ করিত, তবু এভাবে তার কান্নায ভাঙিয়া পড়িবার উপযুক্ত কারণ তো ভূপেনেব বউ আর ছেলের মবণ নয় ! সহানুভূতির কান্না কি এমন হয় ?

ব্যাপারটা ভূপেন ঠিক বুঝিয়া উঠিতে পারে না। প্রভাকে সে কোনোদিন কাঁদিতে দেখে নাই। বছরখানেক আগে প্রভার ছোটো ভাইটি যখন মারা যায় প্রভা নাকি তখন ভয়ানক কাঁদিয়াছিল। ভূপেন সে সময় এখানে ছিল না। আজ প্রভার কান্নার ভঙ্গিটা ভূপেনের অভিনব এবং খাপছাড়া মনে হইতে থাকে।

কান্নার বেগ কমিয়া আসিলে প্রভা বলে, কী করে সইবেন ভূপেনবাবু ? পঞ্চুর কথা মনে হলে আজও যে আমার বুক ফেটে যায় । মনে হয় আমার কেউ নেই, সব শূন্য হয়ে গেছে।

এবার কতকটা বুঝিতে পারিয়া ভূপেন ভাবে, প্রভার তো নিজের ছেলেমেয়ে নাই, তাই ছেলেকে আর ভাইকে হারানোর তফাতটা ঠিক ধারণা করিয়া উঠিতে পারিতেছে না। ছেলে মরিয়া গেলে মানুষের কেমন লাগে, ও তার কী বুঝিবে !

একটু ভাবিয়া ভূপেন বলিল, কেঁদো না প্রভা। শোক পাওয়া সংসারের রীতি, কী করবে বলো। মানুষের তো কোনো হাত নেই !

প্রভা আরও জোরে কাঁদিয়া উঠিল।

আমি চেষ্টা করলে হয়তো নন্তুকে বাঁচাতে পারতুম ভূপেনবাবু।

শুনিয়া ভূপেন ভাবিল, ডাক্তার হোক আর যাই হোক, প্রভা মেয়েমানুষ তো, এ রকম আবোল-তাবোল কথা মনে হওয়া আশ্চর্য নয়।

কেবল মেয়েমানুষ বলিয়াই প্রভার উপর আজ ভূপেন যেন বিশেষ মমতা বোধ করে। এবং বোধ হয় সেই জন্যই দুপুরবেলা উদ্দেশ্যহীনভাবে বাড়ির বাহির হইয়া কী করিবে ভাবিতে গিয়া প্রথমেই ভূপেনের মনে হয়, প্রভাদের বাড়ি যাওয়ার কথা। কিন্তু মোটে কয়েক ঘণ্টা আগে প্রভা আসিয়া তার সঙ্গে দেখা করিয়া কাঁদিয়া গিয়াছে, এখন আবার তাদের বাড়ি যাইতে ভূপেনের সংকোচ বোধ হয়। অন্যসময় অন্যঅবস্থায় প্রভা আসিলেও একবার ছাড়িয়া দশবার তাদের বাড়ি যাওয়া চলিত, আজ বোধ হয় একটু খারাপ দেখাইবে গেলে। প্রভা কী ভাবিবে কে জানে !

ট্রামে উঠিয়া সে টিকিট করে শহরের অন্যপ্রান্তে যাওয়ার, যেখানে প্রভাদের বাড়ি। কিন্তু চৌরঙ্গীতে নামিয়া গাড়ি বদল করার পরিবর্তে টিকিটটা ফেলিয়া দেয়। তারপর কী ছবি দেখানো হইতেছে নাম না পড়িয়াই একটা সিনেমায় ঢুকিয়া পড়ে। টিকিট কেনার সময় সে বড়োই সংকোচ বোধ করে, ভিতরে গিয়া বোধ করে অস্বস্তি। আজ কি তার সিনেমা দেখা উচিত ? চেনা মানুষ কেউ তাকে এখানে দেখিলে কী মনে করিবে কে জানে ! কেবল তাই নয়, ভূপেনের মনে হইতে থাকে, আজ সিনেমায় আসিয়া সে যেন সরমা আর নন্তুর স্মৃতিকে কেমন অপমান করিতেছে। ওরা দুজন যে সত্যই নাই, এ চিন্তায় ভূপেন এখনও অভ্যস্ত হইতে পারে নাই। ওদের যে পুড়াইয়া ফেলা হইয়াছে এ কথাটা সব সময়েই মনে থাকে বটে কিন্তু সেই সঙ্গে ওদের এতকালের অস্তিত্বের অনুভূতিও যেন আগের মতোই জোরালো হইয়া আছে।

পর্দায় একজনকে কাঁদিতে দেখিয়া ভূপেন ছবির দিকে মনোযোগ দিয়া কারণটা বুঝিবার চেষ্টা করে। তারপর ছবিটা তার ভালো লাগিয়া যায়, আর কিছু মনে থাকে না। কাহিনিটা উদ্ভট, অন্যসময় ভূপেনের বিরক্তি বোধ হইত, আজ অবাস্তব নরনারীর জীবনে স্রোতের মতো খাপছাড়া অসম্ভব ঘটনা ঘটিতে দেখিয়া তার এমন মজা লাগে বলিবার নয়। এবং ছবি শেষ হওয়ামাত্র তার মনে হয়, এ জগতে যখন ধরাবাঁধা কোনো নিয়ম নাই, এখন তার প্রভাদের বাড়ি যাওয়ার মধ্যে দোষের কী থাকিতে পারে ?

বাড়ির মধ্যে প্রভা খুব হাসিতেছিল, বাহিরের ঘর হইতে শোনা যায় এত জোরে। শুনিয়া ভূপেনের মস্ত একটা দুর্ভাবনা যেন কাটিয়া যায়। আজ সকালে প্রভা নন্তু আর সরমার জন্য কাঁদিতেছে মনে করিয়া প্রথমটা তার কীরকম খারাপ লাগিয়াছিল এবং কান্নাটা তার নিজের ভাইয়ের জন্য জানিতে পারিয়া কীরকম নিশ্চিন্ত হইয়া গিয়াছিল, তখন খেয়াল না হোক পরে ভূপেন সেটা বুঝিতে পারিয়াছিল। কথাটা জটিলও নয়, দুর্বোধ্যও নয়। যতই কষ্ট হোক, মুক্তির একটা অবাধ অনুভূতিও যে প্রথম হইতে জাগিয়া আছে সেটা না মানিয়া ভূপেনের লাভ কী ? শীতকালের শেষাশেষি হাড়কাঁপানো শীতের মধ্যেও হঠাৎ একদিন আবহাওয়ার পরিবর্তন অনুভব করার মতো স্ত্রী-পুত্রের শোকের মধ্যে হালকা ও ব্যাপক মুক্তির স্বাদ সে যদি পায়, প্রভার তো অভদ্র রকমের আনন্দ বোধ করাই উচিত। আহা, আজ কতকাল মেয়েটা শুধু তাকে একবার দেখিবার জন্য, তার দুটি কথা শুনিবার জন্য ব্যাকুল আগ্রহে ছুটিয়া ছুটিয়া তার বাড়িতে গিয়াছে ! বছরের পর বছর বোকার মতো সে কী রকম নির্বিকারভাবে প্রভার নীরব পূজা গ্রহণ করিয়া আসিয়াছিল ভাবিলে ভূপেনের কান

গরম হইয়া ওঠে। সরমাকে বিবাহ করিবার সময় একবার তার মনেও হয় নাই, তার বউ হওয়ার জন্য মনে মনে প্রভা ছটফট করিতেছে। ও রকম সাধারণ শ্রীহীন একটা মেয়ে যে আবার মনের মধ্যে এ ধরনের কামনা পোষণ করিতে পারে, এ ধারণাই তার ছিল না। প্রায় তিন-চারবছর পরে প্রভার মনের অবস্থা সম্বন্ধে তার প্রথম সন্দেহ জাগে,—তাও প্রভার কথা তুলিয়া সরমা মাঝে মাঝে তাকে ঠাট্টা করিত বলিয়াই কথাটা তার খেয়াল হইয়াছিল। তারপরেও ব্যাপারটার গুরুত্ব উপলব্ধি করিতে তার কী কম সময় লাগিয়াছে !

বুঝিয়াও যেন বুঝা যায় নাই, বিশ্বাস করিয়াও বিশ্বাস করিতে ভরসা হয় নাই। মন বড়ো শক্ত প্রভার, কথায় কাজে মনের ভাব সে সহজে ধরা পড়িতে দেয় না। তবে ক্রমে ক্রমে ভূপেনের নিজের দৃষ্টিশক্তি যেন তীক্ষ্ণ হইয়াছে, বোধশক্তি বাড়িয়াছে। প্রভার সম্বন্ধে যে কথাটা প্রথমে নিজের কাছেই উদ্‌ভ্রান্ত কল্পনা বলিয়া মনে হইত, পরে নানারকম যুক্তি দিয়া সেই কথাটাকেই সে সত্য বলিয়া দাঁড় করাইতে শিখিয়াছে। প্রভার চোখের দৃষ্টিতে নেশার অস্পষ্ট ইঙ্গিতের মতো একটা দুর্বোধ্য স্বপ্নময় ভাব আছে বলিয়া যেদিন প্রথম মনে হইয়াছিল, ব্যাপারটা সেদিন রীতিমতো হাস্যকর ঠেকিয়াছিল ভূপেনের কাছে। নিজের ছেলেমানুষি ভাবপ্রবণতার প্রমাণ বলিয়া মনে হইয়াছিল নিজের এই আবিষ্কার। কিন্তু আজকাল প্রভার চোখের দিকে চাহিয়া প্রায়ই সে স্পষ্ট দেখিতে পায়, কুয়াশার মতো ঘোলাটে কিছু প্রভার দৃষ্টিকে যেন নিষ্প্রভ করিয়া রাখিয়াছে। আর খাপছাড়া ঠেকে না। এ রকম হওয়াই সঙ্গত মনে হয়। এতকাল মন যদি প্রভার আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়া থাকে প্রেম, চোখে তার ছাপ পড়িবে বইকী !

হাসি থামাইয়া মুখ গম্ভীর করিয়া প্রভা নামিয়া আসিল, খানিকক্ষণ একেবারে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিয়া সে বোধ হয় ভূপেনের আকস্মিক আবির্ভাবের কারণটা বুঝিবার চেষ্টা করিল, তারপব হঠাৎ বসিয়া পড়িল নিজে।

আজ আপনি আসবেন ভাবিনি।

কোথায় আর যাব বলো ? তুমি ছাড়া আমার কে আছে।

নিজের অসহায় অবস্থাটা এমন স্পষ্টভাবে ঘোষণা করিয়া ভূপেন পরম তৃপ্ত বোধ করে। অনেককাল তপস্যা করার পর ভক্তকে বর দিতে আসিয়া দেবতার কেমন লাগে ভূপেনের জানিবার কথা নয়, তবু তার মনে হইতে থাকে, সে যেন ওইরকম একটি দেবতার পদ পাইয়াছে। বরদানের ভূমিকাটিও যে বেশ লাগসই হইয়াছে প্রভার চকিত দৃষ্টিপাতে সেটুকুও সে বুঝিতে পারে। কিন্তু তারপর প্রভার মুখে যে ভয় আর ভাবনার স্পষ্ট ছাপ পড়ে, সেটা একটু দুর্বোধ্য মনে হয় ভূপেনের।

প্রভা একটু ভাবিয়া বলে, আপনার কথাই সারাদিন ভাবছিলাম।

তা জানি।

শুনিয়া ভ্রু কুঁচকাইয়া প্রভা যেন খানিকক্ষণ অবাক হইয়াই ভূপেনের মুখের দিকে চাহিয়া থাকে।

আমার কী মনে হয় জানেন ? মনে হয়, আপনি কয়েকদিন কোথা থেকে ঘুরে এলে পারেন। কী আর করবেন এখানে থেকে ?

ঘুরে আসতে বলছ ? তা যেতে পারি—তুমি যদি সঙ্গে যাও।

শুনিয়া প্রভা হঠাৎ হাসিয়া বলে, আপনি আশ্চর্য মানুষ, চা খাবেন ?

ভূপেন বলে, কেন খাব না ?

চাও খাওয়া হয়, কিছুক্ষণ গল্পগুজবও চলে। তারপর ভূপেন আবার বেড়াইতে যাওয়ার কথা তোলে। ধরা যাক ভূপেন গেল, সঙ্গে গেল ভূপেনের মা আর বোন, প্রভা কি তাদের সঙ্গে যাইতে পারে না ?

তুমি বুঝি ভাবছিলে তোমায় নিয়ে একা পালিয়ে যাবার মতলব করেছি।

প্রভা বলে, না, তা ভাবিনি। কিন্তু রুগিপত্র ফেলে আমি কী করে যাব ? এখুনি তো আমায় উঠতে হবে—একটা ডেলিভারি কেস আছে। আপনার সঙ্গে যে দু-দণ্ড গল্প করব তারও উপায় নেই।

প্রভা ডাক্তার, রুগিপত্র ফেলিয়া ভূপেনদের সঙ্গে দেশভ্রমণে যাওয়া তার পক্ষে সম্ভব নয়, বসিয়া যে ভূপেনের সঙ্গে একটু গল্প করিবে সে সময়ও তার নাই। বাড়ি ফিরিবার পথেই ভূপেনের নিজস্ব জগতে একটা যেন ওলটপালট হইয়া যায়। এক মুহূর্তে ভবিষ্যৎ হয় অর্থহীন, কল্পনা হয় তিতো, এমন তীব্র বিষাদ জাগে যেন কিছু পাপ করিয়াছে। এটুকু ভূপেন বোঝে যে ডেলিভারি কেসের দায়িত্ব সহজ নয়, না গিয়া প্রভার উপায় নাই, কিন্তু বুঝিলে কী হইবে ? যত গুরুতর কাজই তার থাক, প্রভা তাকে স্পষ্ট ভাষায় বলিয়াছে, আমার কাজ আছে আপনি এবার যান। এ কথা এভাবে প্রভা যদি বলিতে পারে, এতদিন প্রভার সম্বন্ধে সে যা ভাবিয়া আসিয়াছে তা তো সত্য হইতে পারে না !

সেইদিন বাড়ির লোকে প্রথম টের পাইল, নিজের ঘরে আরাম কেদারায় চিত হইয়া ছেলে আর বউয়ের শোকে ভূপেন কাঁদিতেছে। ঘরে আলো জ্বলিতেছিল, ভূপেন চোখে হাত চাপা দিয়া শুইয়া আছে। পা টিপিয়া টিপিয়া কাছে গিয়া বউদিদি দেখিয়া আসিল, গালে জলের স্রোতের দাগ।

তাই বটে। পুরুষ মানুষ কী আর চ্যাঁচাইয়া কাঁদে !

বউদির কাছে খবর পাইয়া প্রায় সকলেই আসিল। চাপা আর্তনাদের কয়েকটা অদ্ভুত শব্দ কানে যাওয়ায় ভূপেন চোখ মেলিয়াই দ্যাখে, তাকে ঘিরিয়া আপনজনের ভিড়। এতক্ষণ সে ছেলে আর বউয়ের কথাই ভাবিতেছিল। সব মনে হইতেছিল শূন্য, ভিতরে পাক খাইতেছিল একটা অসহায় যন্ত্রণা। চোখ দিয়া যে জল পড়িতে আরম্ভ করিয়াছে ভূপেন জানিতেও পারে নাই। এখন টের পাইয়া সে আশ্চর্য হইয়া গেল।

ভূপেনের সজল উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টি দেখিয়া বাড়িতে একটা বিষম কাণ্ড বাধিয়া যায়। দিদির ফিট অনেকক্ষণ বন্ধ ছিল, একটা চিৎকার করিয়া সে ঢলিয়া পড়ে। ভূপেনের ছোটোবোন অনু, দেয়ালে মাথা ঠুকিয়া ঠুকিয়া মাথাটা যার এবড়োখেবড়ো হইয়া গিয়াছে, খানিকক্ষণ বিস্ফারিত চোখে দিদিকে দেখিয়া সেও এবার মূর্ছা যায়।

বউদিদি কাঁদিতে কাঁদিতে বলে, কী হল দ্যাখো ঠাকুরপো।

ভূপেন শান্তভাবেই বলে, হবে আবার কী, সব হিস্টিরিয়া। ওদের চিকিৎসা হওয়া দরকার। প্রভাকে ডাকব ফোন করে ?

এত রাত্রে ডাকবে প্রভাকে ?

প্রভাকে বউদিদি পছন্দ করে না।

প্রভা সব সময়েই যেন তার সমালোচনা করে। ছেলেমেয়েদের গাদা গাদা খাওয়ানো ভালো নয়, শিশু যে সব সময় ক্ষুধায় কাঁদে তা নয় পেটের ব্যথাতেও অনেক সময় কাঁদে, মার নোংরামির জন্যই অনেক সময় ছেলেমেয়েদের অসুখ হয়, এইসব। সাতটি ছেলেমেয়ে বউদিদির, কুড়ি-বাইশ বছর সে স্বামীর ঘর করিতেছে, ডাক্তারিটা পাশ করিয়াই প্রভা যেন তার চেয়ে বেশি জানে—আজ পর্যন্ত যার একটা স্বামীও জুটিল না !

মুখে জলের ছিটা দিলেই একটু পরে এরা দুজন উঠিয়া বসিবে, সে জন্য রাত এগারোটার সময় প্রভাকে ডাকিয়া পাঠানোর কোনো অর্থই বউদিদি বুঝিতে পারে না। তবে, সোজাসুজি বারণ করিবার সাহসও তার নাই। কদিন বাড়ির লোকের ব্যবহারে সে জ্বালাতন হইয়া গিয়াছে। সরমা আর নন্তুর অসুখের বাড়াবাড়ির সময় বাড়ির ছোটো ছোটো ছেলেমেয়েগুলিকে ভগবানের নামে ছাড়িয়া না

দিয়া তাদের দিকে একটু নজর রাখিয়াছিল বলিয়া প্রমাণ হইয়া গিয়াছে, ভূপেনের ছেলে আর বউয়ের জন্য তার একটুও দরদ নাই। দুজনে মরিয়া গেলে সে খুব কাঁদিয়াছিল, দারুণ শোকের মধ্যেও সকলে বলাবলি করিয়াছিল তার শোকের বাড়াবাড়ির কথা। ভূপেনের বউয়ের সঙ্গে তার মনোমালিন্য ছিল বলিয়া, সাধারণ দৈনন্দিন জীবনে কতগুলি ব্যাপারে ঠোকাঠুকি লাগিত বলিয়া, সে মরিয়া গেলেও যেন তার শোক হওয়া উচিত নয় ! শোকের প্রথম ধাক্কায় সকলে যখন নানারকম পাগলামি আরম্ভ করিয়াছে, তখনও সে শিশুগুলিকে যত্ন করিয়াছিল, সকলকে একটু সংযত করিবার চেষ্টা করিয়াছিল। সে জন্য দিদি যে তাকে কতবার শুনাইয়াছে ঠিক নাই : বেঁচেছিস বড়োবউ, না ? বড়োলোকের মেয়ে ছিল, সকলের আদুরে ছিল, হিংসেয় তাই জ্বলে মরতিস,—হাড়ে তোর বাতাস লেগেছে, না ?

অন্যসময় তার সম্বন্ধে এ ধরনের কথা মনে আসিলেও বাড়ির লোকে সাধারণত চুপ করিয়াই থাকে, অথবা আড়ালে দু-চারজন চুপিচুপি নিজেদের মধ্যে বলাবলি করে। বাড়িতে একটা অসাধারণ অবস্থা সৃষ্টি হওয়ায় মুখ আর কারও আটক থাকে নাই, যা মনে আসিয়াছে মুখের উপর বলিয়া বসিয়াছে। প্রভাকে ডাকিতে বারণ করিলে ভূপেন যদি কিছু ভাবিয়া বসে, আর এখনকার মনের অবস্থায়, বলিয়া ফেলে ? মেয়েদের কথা বউদিদি গ্রাহ্য করে না, কিন্তু ভূপেন অন্যায় কিছু বলিলে বড়োই অপমান হইবে। সে অপমান সহ্য করার ক্ষমতা তার হইবে না, হয়তো চটাচটিই হইয়া যাইবে ভূপেনের সঙ্গে। এখন ভূপেনের সঙ্গে চটাচটি হওয়া উচিত হইবে না। বিবাহ করার আগে ভূপেনের সঙ্গে তার বড়ো ভাব ছিল। আবার ভূপেন একা মানুষ হইয়া গেল। বিবাহ যদি আবার সে করেও,—করিবে যে তাতে অবশ্য বউদিদির কোনো সন্দেহ নাই,—দু-একটা বছর তো এমনি কাটিয়া যাইবে। এই সময়ের মধ্যে বউদিদির সঙ্গে আবার কি আগের মতো ভাব করিবে না ভূপেন ? কয়েক মাস পরে বউদিদির বড়ো মেয়েটার বিবাহে কর্তব্যবোধে যতটা করুক, ভাইঝির উপর স্নেহের বশে যতটা করুক, বউদিদির জন্য তার চেয়ে বেশি কিছু সে কি করিবে না ?

দুটি ননদকে মূর্ছা যাইতে দেখিয়া মনের দুর্বলতায় বউদিদি কাঁদিয়া ফেলিয়াছিল। ভূপেনের শান্ত ভাব দেখিয়া আর প্রভাকে ডাকিবার কথা শুনিয়া চোখের পলকে কান্নাও বন্ধ করিয়া ফেলে, এত সব কথা তার ভাবাও হইয়া যায়। ভূপেনের পরামর্শ চাওয়ার জবাবে আমতা-আমতা করিয়া চারিদিক বজায় রাখিয়া পালটা প্রশ্ন করে। স্পষ্ট বলে না যে এত রাত্রে প্রভাকে ডাকা উচিত নয়। প্রভাকে ডাকাই যে ভালো তাও বলে না।

কিন্তু তার কথা শুনিয়া ভূপেনকে মুখ গম্ভীর করিয়া নীরবে ভাবিতে দেখিয়া বউদিদি একটু ভড়কাইয়া যায়। নিজের বক্তব্য আরও পরিষ্কার করিয়া বলে, তা তুমি যা ভালো বোঝ তাই করো। আমি ও সব কী বুঝি !

ভূপেন জিজ্ঞাসা করে, প্রভাকে তোমার কেমন লাগে বউদি ?

বউদিদি লাগসই জবাব খুঁজিতে খুঁজিতে ভূপেন আবার জিজ্ঞাসা করে, আচ্ছা, সেদিন আমার নামে কী সব বলছিল না তোমাদের কাছে ? আমি ভীষণ শক্ত মানুষ, দয়ামায়ার ধার ধারি না, এইসব ?

বউদি বলে, কই না, ও সব কিছু তো বলেনি। ঠাকুরঝিদের কাছে যদি বলে থাকে—

এতক্ষণে অনু উঠিয়া বসিয়াছে। ভূপেন তাড়াতাড়ি প্রভাকে ফোন করিতে নীচে চলিয়া গেল। সকলে সুস্থ হইয়া উঠিলে এত রাত্রে তাকে ফোন করার আর উপলক্ষ থাকিবে না।

প্রভা আসিয়া পৌঁছিতে পৌঁছিতে রাত্রি বারোটা বাজিয়া গেল। দিদি এবং অনু তখন বেশ সুস্থ হইয়া উঠিয়াছে।

সারাদিন প্রভার দেহ এবং মন দুয়েরই অনেক পরিশ্রম গিয়াছে। বাড়ি ফিরিয়া ঘুমানোর আয়োজন করিতে করিতে ভূপেনের জোর তাগিদে উঠিয়া আসিয়াছে। বিরক্ত হইয়া মুখভার করিয়া সে বলিল, কাল সকালে ডাকলেই পারতেন।

ভূপেন বলিল, দুজনেই অজ্ঞান হয়ে পড়ল কিনা—

প্রভা বলিল, ও রকম যাবা কথায় কথায় অজ্ঞান হয়, তাদের গায়ে বালতি বালতি জল ঢেলে দিতে হয়। আমি ওর কী চিকিৎসা করব !

ভূপেন নিচু গলায় আদর করিয়া বলিল, তুমি রাগ করেছ প্রভা ?

প্রভার বোধ হয় মনে পড়িযা গেল এই মানুষটার সম্প্রতি ছেলে আব বউ মারা গিয়াছে। সেও এবার শান্ত গলায় বলিল, না, রাগ করিনি। বড়ো ঘুম পেয়েছে কিনা—

এখানেই ঘুমিয়ে থাকো ?

এ প্রস্তাবে প্রভা বাজি হইল না। নিজের বিছানাটি ছাড়া তার ঘুম আসে না। তা ছাড়া কাল ভোর হইতে না হইতে রোগী আসা আরম্ভ হইবে।

তখন ভূপেন বলিল, চলো তবে তোমাকে পৌঁছে দিয়ে আসি।

প্রভা বলিল, উঁহু, রাত একটার সময় আপনি আমায় অতদূরে পৌঁছে দিতে যাবেন, তার কোনো মানে হয় না। ফিরতে ফিরতে আপনার আড়াইটে তিনটে বেজে যাবে। কাল বোধ হয় সারারাত ঘুমোননি—

সঙ্গে যে দাসী আসিয়াছিল তার সঙ্গেই প্রভা ফিরিয়া গেল।

দুই

এমনিভাবে প্রভার সঙ্গে ভূপেনের একদিনে তিনবার দেখা হইয়া গেল, ছেলে আব বউয়ের শোকের প্রথম ধাক্কায় সে যখন কাবু হইয়া পড়িয়াছে। তারপর প্রভার সঙ্গে দু-একদিন অন্তর দেখা হইতে থাকে, দিন কাটিতে কাটিতে মাস কাটিয়া যায়। ভূপেন স্পষ্ট করিয়া প্রভাকে কিছু বলে না, ধৈর্য ধরিয়া অপেক্ষা করিয়া থাকে। ভাবে, কিছুদিন চুপ কবিয়া থাকাই উচিত। ছেলেবউ মারা যাওযার পর সময় কাটিতে না দিযা প্রভাকে বলা সঙ্গত হইবে না যে এবার তুমি আমার বউ হও প্রভা।

কেবল এই জন্যই যে ভূপেন চুপ করিয়া থাকে তা নয়। ছেলে আর বউযের শোকটাই তাকে বাধা দেয়। ভূপেন কাঁদে না, কিন্তু ভাবে। প্রায় সব সময়েই ভাবে। চোখ বুজিয়া ভাবিতে ভাবিতে কখনও সরমাকে কখনও নন্তুকে চোখের সামনে দেখিতে পায়, ওদের চোখের মুখের হাতের পায়ের চুলের দাঁতের এক একটি বৈশিষ্ট্য হঠাৎ এক সময় স্পষ্ট হইয়া ওঠে। ওদের হাসিকান্নার মুখভঙ্গি মনে করিতে গিযা শব্দ পর্যন্ত শুনিতে পাইয়া দু-একবার ভূপেন চমকাইয়া পর্যন্ত ওঠে।

সবমার বাক্সো আলমারি ঘাঁটিতে ভূপেনের ভালো লাগে। মাঝে মাঝে দরজা বন্ধ করিয় ঘণ্টাব পর ঘণ্টা ওই খেলাতেই সে মাতিয়া থাকে। কত বিচিত্র কাপড়-জামাই সরমার ছিল প্রসাধনের কত বিভিন্ন সামগ্রী ! গাযে আঁটে না এত সোনাব গয়না ছিল, তবু বাশি রাশি কাচের চুড়ি জমা করা আছে দেখিয়া ভূপেন যেন আশ্চর্য হইয়া যায়, নতুন করিয়া আজ যেন সে বুঝিতে পারে কী ছেলেমানুষই ছিল তার সরমা। দুটি দামি কাপড়ের ভাঁজে খানিকটা আচার পাওয়া যায়। সরমার চুরি করিয়া আচার খাওয়ার শখ ছিল, কে ধরা পড়িবার ভয়ে এখানে আচার গুঁজিয়া দিয়াছিল তারপর আর মনে ছিল না ! তিন শিশি ওষুধ একটি বাক্সের তলে লুকানো অবস্থায় পাওয়া যায় মাস ছয়েক আগে সরমাকে শরীর ভালো করার জন্য ওষুধ দেওয়া হইয়াছিল। এতদিন পরে আজ ভূপেন টের পায় ওষুধ সরমা খাইত না, তাকে ফাঁকি দিয়াছিল। দুষ্টামিও কী কম জানিত তার সরমা

অজস্র স্মৃতিচিহ্নের মধ্যে সরমা তার স্মৃতি আর পরিচয় রাখিয়া গিয়াছে। বাক্সোটি খোলামাত্র যে গন্ধ নাকে লাগে তাও যেন সরমারই একটা ঘনিষ্ঠ স্থায়ী অস্তিত্ব। ভূপেন জোরে শ্বাস টানে

সরমার প্রত্যেকটি দরকারি-অদরকারি জিনিস হাতে করিয়া নাড়িয়া-চাড়িয়া দ্যাখে। কিছুক্ষণ কাটিয়া যাওয়ার পর সে স্পষ্ট বুঝিতে পারে, কেমন যেন একটা নেশা হইয়াছে।

সরমার স্মৃতিচিহ্নের বেলা এ রকম হয়, নন্তুর স্মৃতিচিহ্নের ব্যাপার অন্যরকম। সরমার জামা-কাপড়ের সঙ্গেই নন্তুর কত পোশাক আছে, বাক্সে আলমারিতে তার কত খেলনা, ঘরেও কত কী জমা করা আছে এখানে-ওখানে। কিন্তু নন্তুর কোনো জিনিস যেন সহজে ভূপেনের চোখেই পড়িতে চায় না। দেখিবার বা ঘাঁটিবার বিশেষ আগ্রহও তার নাই। কখনও যদি খেয়াল হয় যে ঘরের কোণের ছোটো টেবিলটার উপরকার ছবির বইয়ের গাদাটি ছিল নন্তুর, ভূপেনের বুকের মধ্যে হুহু করিতে থাকে। এ যে নন্তুর স্মৃতিচিহ্ন, আজ নন্তু নাই বলিয়া কতগুলি আস্ত আর মলাটছেঁড়া নতুন ও পুরাতন শিশুপাঠ্য বই দেখিয়া নন্তুর কথা মনে করিয়া তার কষ্ট হইতেছে, এ সব ভূপেন ভাবে না, ছেঁড়া মলাট দেখিয়া তার মনে পড়িয়া যায় না কী দুরন্ত ছেলেই ছিল তার নন্তু, একটা প্রায় অচিন্তনীয় ও অসহ্য যন্ত্রণা তার ভিতরে মোচন দিতে থাকে।

তবে বেশিক্ষণের জন্য নয়। সরমার কথা মনে পড়িয়া যায়, মনে পড়িয়া যায় যে তার একটি ছেলে ছিল সে ছেলেটি মরিয়া গিয়াছে এবং এই সব কথা মনে পড়িয়া যে গভীর শোক জাগে, তার নীচে নন্তুর সম্বন্ধে মনের দুর্বোধ্য ও যন্ত্রণাদায়ক প্রক্রিয়াটা চাপা পড়িয়া যায়। শ্মশানে ভূতের ভয়ে যার মূর্ছার উপক্রম হয়, ঊর্ধ্বশ্বাসে পলাইয়া আসিয়া সে নিজের ঘরে বসিয়া ভূতের গল্প পড়িয়া শিহরিয়া উঠিতে পারে। ভূপেনও কতকটা সেই রকম করে।

একদিন প্রভা বলিল, আপনি নাকি ঘরের দরজা বন্ধ করে কাঁদাকাটা করেন, বউদির কাছে শুনলাম ?

ভূপেন বলিল, না, কাঁদাকাটা করব কেন ? হইচই গোলমাল ভালো লাগে না, তাই দরজা বন্ধ করে বসে থাকি।

চুপচাপ বসে থাকেন ?

ঠিক চুপচাপ বসে থাকি না—

আরও এক মাসের ছুটি নেবেন শুনলাম ? কোথাও যদি না-ই যান, ঘরের কোণে মন খারাপ করে বসে থাকার জন্য ছুটি নিয়ে লাভ ! তার চেয়ে কাজেকর্মে মেতে থাকা ঢের ভালো।

ভূপেন একটু ভাবিয়া বলিল, এক মাস নয়, তিন মাসের ছুটির দরখাস্ত করেছি। এ তিন মাসের মাইনে পাব। তারপর তিন মাস আদ্দেক মাইনেয় ছুটি নেব, তারপর ছ-মাস বিনে মাইনেয়।

প্রভা আশ্চর্য হইয়া বলিল, কেন ?

কথা হইতেছিল প্রভাদের বাড়িতে, প্রভার ঘরে, দুপুরবেলা। সকালে প্রভা ভূপেনদের বাড়ি গিয়াছিল, ভূপেন বাড়ি ছিল না। ভূপেন তাই দুপুরবেলাই দেখা করিতে আসিয়াছে। দেরি করিয়া আসিলে অবহেলা মনে করিয়া প্রভার মনে যদি কষ্ট হয় ? দুপুরবেলা এ সময়টা প্রভার একটু ঘুমানো অভ্যাস। চোখ দুটি তার ঝিমাইয়া আসিয়াছিল। বিস্মিত হইলে প্রভা মাথাটা একটু পিছন দিকে ঠেলিয়া ঘাড়টা একটু বাঁকাইয়া আড়চোখে তাকায়, সেই সঙ্গে শরীরটাও একটু বিশেষ ভঙ্গিতে কাত হইয়া পড়ে। এটা তার চিরদিনের অভ্যাস। ভূপেনের অনেকবার দেখিবার সুযোগ হইয়াছিল, কিন্তু কোনোদিন চাহিয়া দ্যাখে নাই। আজ খুঁটিয়া খুঁটিয়া বিশেষভাবে দেখিতে দেখিতে প্রভার প্রশ্নের জবাব দিতে সে ভুলিয়া গেল।

প্রভার বিস্ময় কমিয়া গেল। অস্বস্তি বোধ করিয়া সে আবার বলিল, এতদিনের ছুটি নেবেন কেন ?

তখন ভূপেন বলিল, বছরখানেক না কাটলে তো আর আমাদের বিয়েটা হতে পারবে না। আমার যা মনের অবস্থা তাতে আপিসের কাজ আমার দ্বারা হবে না প্রভা। তুমি যা ভাবছ তা কিন্তু

নয় প্রভা, তোমার জন্যই মনটা আমার বেশি অস্থির হয়ে পড়েছে। সাত-আটবছর তোমার মনে কষ্ট দিয়েছি ভাবলেই—

প্রভার চোখে, মুখে এবং দেহে আবার বিস্ময়ের ভঙ্গি ফুটিয়া ওঠে। প্রভাকে কী বলিবে ভূপেন অনেকবার ভাবিয়া রাখিয়াছিল, এতদিনে মুখস্থ হইয়া যাওয়ার কথা। আজ যে বলিবে এটা অবশ্য ঠিক ছিল না, তবু ভাবিযা বাখা কথাগুলির বদলে এ সব কথা বলিয়া ফেলিল কেন ভূপেন বুঝিতে পাবে না। শান্তভাবে সরল ভাষায় প্রভাকে জানানো যে সে তাকে বহুদিন হইতে ভালোবাসে এবং তেমনই সহজ শান্তভাবে বাকি জীবনটা একসঙ্গে কাটানোর জন্য তার সম্মতি চাওয়া, এর মধ্যে সাত-আটবছর প্রভার মনে কষ্ট দেওয়ার প্রশ্ন তো নাই !

বিব্রতভাবে ভূপেন আবার বলিল, আমি বলছিলাম কী, লোকে যা ভাবে ভাবুক, আর মাসখানেকের মধ্যে আমরা বিয়েটা সেরে ফেলি এসো। এতদিন উপায় ছিল না কোনোরকমে কাটিয়েছি, এখন আর তোমায় ছেড়ে একটা দিনও থাকতে পারছি না প্রভা।

প্রভা নীরবে উঠিয়া জানালার কাছে সরিয়া গেল। জানালায় কিছুই দেখিবার নাই, কয়েক হাত তফাতেই পাশের বাড়ির দেয়াল। মাঝখানে ইটপাতা সরু গলি, পায়ে পায়ে ইটগুলি ক্ষয় হইয়া গিয়াছে। প্রভার মাথার পিছনে আলগা অসম্পূর্ণ খোঁপা দেখিতে দেখিতে ভূপেনের হঠাৎ আঘাত পাওয়ার মতো তীব্র লজ্জা বোধ হয। কেবল লজ্জা নয়, ঘুম বা নেশার ঘোর কাটিয়া সচেতন হইয়া উঠিবার মতো একটা অনুভূতি এমন স্পষ্টভাবে সে অনুভব কবিতে আরম্ভ কবে যে তার মনে হয় অনেকগুাল দিন একটা অদ্ভুত আত্মবিস্মৃতিব মোহে আচ্ছন্ন হইযা থাকিবার পর এই মুহূর্তে সত্য সত্যই বুঝি তাব চেতনা হইযাছে। এই কযেকদিন, সবমা ও নন্তুর মৃত্যুর পবের দিনগুলি, কিছুই সে সজ্ঞানে কবে নাই।

কী ভাবিতেছে প্রভা ? বুড়ো বযসে বউ মরামাত্র আবার বিবাহ করার জন্য তাকে খেপিয়া উঠিতে দেখিয়া হয়তো সে স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছে। হযতো বুঝিয়াই উঠিতে পারিতেছে না, স্ত্রীপুত্রের জন্য যার চোখের জল শুকানোব সময় পায় নাই সে কেমন কবিয়া এত সহজে আর একজনের কাছে বিবাহের প্রস্তাব করে। হঠাৎ ঝোঁকের মাথায় আত্মবিস্মৃতির মুহূর্তে কথাগুলি সে বলিয়া ফেলে নাই, প্রভা তা জানে। সে রকম কোনো ভূমিকাই গড়িয়া ওঠে নাই। আজও নয়, আগেও নয়। প্রৌঢ় বযসের স্বাভাবিক ধীরতার সঙ্গে প্রায় আবেগহীন ভাষায় সে ঘোষণা করিয়াছে তার প্রেম ও প্রয়োজনের প্রস্তাব। তার প্রেম ও তার প্রযোজন। প্রভাকে নিমন্ত্রণ করিতে আসিয়া সে যেভাবে প্রভাকে বলিত, তুমি না গেলে কিন্তু চলবে না প্রভা, সেইভাবে সে তাকে জানাইয়া দিযাছে তাকে ছাড়িয়া একটা দিনও সে থাকিতে পারিতেছে না। গলাটা একটু কাঁপিয়া পর্যন্ত যায় নাই।

বিয়াল্লিশ বছর বযস হইয়াছে। বিয়াল্লিশ বছর ! অথবা তেতাল্লিশ ? তেতাল্লিশ হওয়াও তো আশ্চর্য নয়। ভূপেন আশ্চর্য হইয়া যায়। নিজের বয়স সম্বন্ধে তার সঠিক ধারণা নাই, মনে মনে একটা আন্দাজি হিসাব রাখিয়াই সন্তুষ্ট হইয়া আছে ? বছরের কী এত ছড়াছড়ি জীবনে যে একটা হিসাব রাখিতেও এত অবহেলা ?

প্রভার কত বয়স হইয়াছে?

সরমার বয়সটা মনে আছে। আর নন্তুর। বিবাহের সময় সরমার বয়স ছিল সতেরো, দশ বছর পরে সে মারা গিয়াছে। নন্তু বাঁচিয়া থাকিলে এই ফাল্গুনে তার ন-বছর বয়স হইত।

সরমার চেয়ে প্রভা তিন-চারবছরের বড়ো। প্রভার তবে ত্রিশের কাছে বয়স পৌঁছিয়াছে ! তাই বটে। একটু তাই মোটা হইয়া পড়িয়াছে প্রভা আজকাল, একটু শিথিল হইয়া পড়িয়াছে তার দেহ আর মন, কথা আর চালচলনে আসিয়াছে গাম্ভীর্য ! একদিন, অনেকদিন আগে, সিঁড়ির উপর দাঁড়াইয়া ধাপে ধাপে পা ফেলিয়া প্রভাকে নামিতে দেখিয়া তার মন ভুলিয়াছিল, মনে হইয়াছিল তার নিজের

জীবনের ছন্দ ও তরঙ্গ যেন রূপ ধরিয়া নীচে নামিয়া দূরে চলিয়া যাইতেছে। আজ সমতল মেঝেতে পা ফেলিয়া পিছন ফিরিয়া দাঁড়াইয়া থাকার সময় প্রভাকে একটু মোটা মনে হইতেছে বটে।

বাহিরের সঙ্গে ভিতরেও প্রভার পরিবর্তন ঘটিয়াছে, কেবল তার নিজের পরিবর্তন নয়। ভূপেন ভাবে : এতগুলি বছর ধরিয়া চোখের সামনে ধীরে ধীরে প্রভার এই পবিবর্তন না ঘটিয়া যদি চোখের আড়ালে ঘটিত ? আজ হয়তো প্রভাকে এত সহজে মনের কথা সে বলিতে পারিত না। ইচ্ছা থাকিলেও সাহস হয়তো হইত না।

প্রভা ফিরিয়া আসিয়া সামনে একটা চেয়ারে বসিল। তার মুখ দেখিয়া বুঝিবার উপায় নাই ভূপেনের আকস্মিক আত্মপ্রকাশ তাকে কিছুমাত্র বিস্মিত বা বিচলিত করিয়াছে। তার শান্ত নির্বিকার মুখের ভাব দেখিয়া ভূপেন ক্ষুব্ধ হইয়া উঠিল।

এখন ও সব আলোচনা থাক, ভূপেনবাবু।

কালও প্রভা তাকে ভূপেনবাবু বলিয়াছে, আট-নবছর ধরিয়া বলিয়া আসিতেছে। অনেকদিন আগেই হয়তো প্রভা আপনি ছাড়িয়া তুমিতে নামিয়া আসিতে পারিত, শুধু চলিয়া আসিতেছিল বলিয়াই অভ্যাসের মতো ভূপেনবাবু বলাটাই বজায় থাকিয়া গিযাছে। আজ সম্বোধনটা ভূপেনেব কানে বিঁধিবার কোনো কারণ ছিল না। অবুঝ শিশুর মতো ভূপেন তবু এই অর্থহীন শব্দকে যাচিয়া সংকেতের অর্থ দিয়া মনে মনে অসন্তুষ্ট হইয়া উঠিল।

কেন ?

আপনার যে রকম মানসিক অবস্থা—

আমার মানসিক অবস্থা ঠিক আছে।

তাই কি থাকতে পারে ? বউদি আব নন্তুর জন্য আপনার মন—

ওদেব কথা বাদ দাও প্রভা। ওদের আমি ভুলতে চাই।

ভুলতে চাইলেই কী ভোলা যায় ? ভুলবার কথা হলে ভুলবার জন্য চেষ্টা করতে হয় না। আপনা থেকেই মানুষ ভুলে যায়। আপনি আজ যা বললেন, কেবল আমার জন্য বলেননি। তা হলে এত শিগগির বলতে পারতেন না। ওদের জন্য আপনার ভয়ানক কষ্ট হচ্ছে। সে কষ্ট সইতে পারছেন না বলেই এত ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন। আপনি ভাবছেন অন্যরকম কিন্তু আপনাব মনেব তলে তাগিদ আছে, যে কোনো উপায়ে হোক কষ্টটা যাতে সহ্যের সীমায আনা যায।

ভূপেন আহত বিস্ময়ে প্রভার মুখের দিকে চাহিয়া থাকে। কোনোদিন সে প্রভাকে মুখে কিছু বলে নাই, অন্যভাবে জানানোর কোনো চেষ্টাও করে নাই, তবু এতকাল তার ধারণা ছিল প্রভা সব জানে। একটা অনির্দিষ্ট সুখের মতো এই ধারণা তার মনে দিনের পর দিন স্থান পাইয়া আসিযাছে। আব কিছু না হোক, প্রভা সব জানে। কতদিন প্রভার সঙ্গে নন্তুর অসুখেব কথা আলোচনা করিতে করিতে দুজনে তারা নির্বাক হইয়া গিয়াছে, প্রভার ক্লিষ্ট মুখে গভীর শ্রান্তির ছাপ দেখিয়া সে কী করিবে ভাবিয়া পায় নাই। তারপর প্রভার মুখে ধীরে ধীরে শান্তি ও তৃপ্তির লাবণ্য ঘনাইয়া আসিতে দেখিয়া নিজেও যে কী গভীর স্বস্তি বোধ করিয়াছে বলিবার নয়। ভাবিয়াছে, হতাশার মধ্যে প্রভা এতক্ষণে সান্ত্বনা খুঁজিয়া পাইল, এতক্ষণে তার মনে পড়িয়া গেল যে সে একা নয়, সামনে যে মানুষটা বসিয়া আছে, সেও তাকে চায়।

আজ প্রভা তার ব্যাকুলতার মানে করিতেছে অন্যরকম। স্ত্রীপুত্রের শোকে তার মাথা খারাপ হইয়া গিয়াছে তাই সে তাকে চায়, শোকের অসহ্য জ্বালার মলম হিসাবে। আট বছর ধরিয়া তার মনকে জানিয়া রাখিলে তার কথার এ ব্যাখ্যা করা তো প্রভার পক্ষে সম্ভব হইত না।

প্রভা আবার বলিল, ছুটি নেবেন বলেছিলেন, তাই করুন আপনি। ছুটি নিয়ে ঘুরে আসুন বাইরে থেকে। মন শান্ত হয়ে যাবে।

মন তো বিশেষ অশান্ত মনে হচ্ছে না প্রভা।

নিজেই তো বললেন।

তুমি যা বলছ আমি তা বলিনি।

আপনি কি বলতে চান বউদি আর নন্তুর জন্য আপনার একটুও কষ্ট হয়নি ? ওদের ভুলে গেছেন ?

অমন কথা বলতে চাইব কেন ?

তাই তো মানে দাঁড়ায় আপনার ব্যবহারের। হয় ওদের শোকে দিশেহারা হয়ে গেছেন, নয় ওদের মনে নেই। আর কী মানে হতে পারে বলুন ?

এতদিন পরে প্রভাকে মানে বুঝাইয়া বলিতে হইবে !

তুমি জান না মানে ?

ভেবে তো পাচ্ছি না।

অভিভূতের মতো খানিকক্ষণ বসিয়া থাকিয়া ভূপেন হঠাৎ উঠিয়া দাঁড়াইল। শোক-দুঃখে ভরা জীবনে তার আজ প্রথম এক যন্ত্রণাদায়ক ধাঁধা আসিয়াছে। মিথ্যা আর ভুলে ভরা এক অবিশ্বাস্য দুর্বোধ্য অভিজ্ঞতা।

যাওয়ার সময় প্রভা মৃদুস্বরে বলিল, রাগ করলেন ?

ভূপেন বলিল, না। রাগ করার কী আছে ?

তিন

প্রভার উপর রাগ করিয়াই ভূপেন ছুটির দরখাস্ত বাতিল করিয়া দিল। মন অশান্ত বলিয়া সে দিশেহারা হইয়া গিয়াছে, পাগলামি করিয়াছে ? প্রভা বুঝুক, মন অশান্ত হইলেও সে দিশেহারা হয় না, পাগলামি করে না। দুঃখকষ্ট সহ্য করিবার জন্য তাকে ছুটি লইয়া দূরে পলাইয়া যাইতে হয় না।

সরমা আর নন্তুর জন্য শোকের তীব্রতা সাধারণ নিয়মেই কমিতে থাকে। কেবল জাগিয়া থাকে একটা গভীর অভাব বোধ। আঘাতের বেদনা দিয়া সে অভাব বোধকে আর অবশ করিয়া রাখা যায় না, বৈরাগ্যের উদাসীনতা দিয়া অবহেলাও করা যায় না। রীতিমতো অসন্তোষ লইয়া দিন কাটাইতে হয়। ফাঁকার মর্যাদাহানি ঘটে এবং অপবাদ জোটে ফাঁকির। প্রথম যৌবনের কাব্যোন্মাদনাকে মহাজনব্রতী—কমবেশি যে ব্রত সকলেরই পালনীয়—যেমন গাল দেয়।

স্নেহ করার সঙ্গে সরমাকে ভূপেন শ্রদ্ধা করিত, মনে মনে তাকে একটু ভয় করার অভ্যাসও বুঝি তার জন্মিয়া গিয়াছিল। তার এই বিস্ময়কর মানসিক প্রক্রিয়ার যুক্তিসঙ্গত ব্যাখ্যা করা কঠিন।

প্রভাকে পাইয়া জীবনের পরিপূর্ণতা লাভের বাধা ছিল সরমা। সাত-আটবছর ধরিয়া সে জানিয়া রাখিয়াছিল, সরমার জন্যই প্রভার সঙ্গে শুধু ভদ্র ব্যবহারের সম্পর্ক বজায় রাখিয়া তাকে বাকি জীবনটা কাটাইয়া দিতে হইবে। তবু কোনোদিন সে সরমার উপর বিদ্বেষ অনুভব করে নাই। বরং সর্বদা সরমার কাছেই নিজেকে তার অপরাধী মনে হইয়াছে। সরমার জন্য বঞ্চিত জীবনযাপন করিতে হইবে বলিয়া না হোক, তার কাছে এই অপরাধের অনুভূতিতেই ভূপেনের মনে বিদ্রোহ জাগা উচিত ছিল, কারণ, মানুষের মন আত্মপীড়নের উপলক্ষকে ঘৃণা করে। কিন্তু ভূপেনের মনে প্রতিক্রিয়া হইয়াছে বিপরীত, সরমার জন্য সে বোধ করিয়াছে মমতা। কারণটা বোধ হয় এই যে চিরদিন সে বিশ্বাস করিয়াছে সরমাকে কিছুদিন সত্যসত্যই সে ভালোবাসিয়াছিল এবং সরমা তাকে সর্বদা ভালোবাসে, তার মনটাও সরমার সম্পত্তি, প্রভাকে দান করার কোনো অধিকার তার নাই। সে প্রভাকে চায় জানিতে পারিলে বেচারি সরমা মনের দুঃখেই মরিয়া যাইবে, এই ছিল ভূপেনের ধারণা।

অনেক সময় সে সরমার সেই মর্মাহত অবস্থা কল্পনা করিত আর সহানুভূতি ও মমতায় সে নিজেই হইয়া পড়িত কাতর। সরমা যে অসুখী ছিল তা নয় কিন্তু নিজের এই কল্পনা ভূপেনের মনে তাকে করিয়া রাখিত বিষাদময়ী।

সাধারণ জীবনের খুঁটিনাটি সুখসুবিধা ও অভ্যাসের ব্যতিক্রমে বিরক্তি বোধ করিবার মতো মানসিক অবস্থা ফিরিয়া আসিলে ভূপেন অনুভব করিতে লাগিল, কতদিকে কতভাবে সরমার জীবনের সঙ্গে জীবনটা তার জড়াইয়া গিয়াছিল।

জীবনে তার প্রথমে আসিয়াছিল সরমা, তারপর মনে আসিয়াছিল প্রভা। তারপরেও সরমার সঙ্গেই তার জীবন কাটিয়াছে বছরের পর বছর, প্রভাকে সে চাহিয়াছে মনে মনে। আজও সে প্রভাকে চায় কিন্তু সরমাকে ছাড়া কী করিয়া তার দিন কাটিবে তাও সে ভাবিয়া পাইতেছে না ! সরমার সেবা, সংসারের ছোটোবড়ো ব্যাপারে সরমার সঙ্গে পরামর্শ সম্মুখে অথবা আড়ালে সবমার উপলব্ধ উপস্থিতি, এ সবও যে তার বাঁচিয়া থাকার জন্য এত বেশি প্রয়োজনীয় ভূপেন তা জানিত না। সারাটি সন্ধ্যা প্রভাকে ঘিরিয়া মনে মনে স্বপ্ন রচনা করিয়া শুইতে গেলে আজও তার সরমার অভাবেই বিছানা খালি মনে হয়, মাঝরাত্রে ঘুম তার ভাঙে সরমাকে চাহিয়া। ভূপেনের গভীর সংশয় জাগে। মাঝে মাঝে মনে হয়, প্রভাকে কাছে না পাইলেও তাকে কেন্দ্র করিয়া কল্পনা ও কামনার জাল বুনিতে বুনিতে দিন যদি বা কাটানো চলে, বাস্তব জীবনে সরমার অভাব সহ্য করিয়া বাঁচিয়া থাকা সম্ভব নয়।

কিন্তু প্রভাকে কেন্দ্র করিয়া কল্পনা ও কামনার জাল বুনিবার দিনও তাব শেষ হইয়া গিয়াছে ! প্রভা তার স্বপ্ন জানে না, মানে না। স্ত্রীপুত্রের জন্য নিজের ও বাড়ির মানুষেব কান্নার দিনগুলি কাটিবার আগেই তাকে লইয়া নতুন জীবন শুরু করিবার প্রস্তাব শুনিয়াই প্রভা চমকাইয়া গিয়াছে, ধরিয়া লইয়াছে এটা এক শোকার্ত মানুষের পাগলামি।

কথাটা ভাবিতে গেলেও ভূপেনের মাথা ঘুরিয়া যায়। প্রভা তাকে ভালোবাসে না, প্রভা জানে না সে তাকে ভালোবাসে ! সাত-আটবছর এমন একটা ভুল ধারণা সে পোষণ করিয়া আসিয়াছে, একী সম্ভব হয় ? দিনের পর দিন কত ঘনিষ্ঠভাবে তারা মেলামেশা করিয়াছে, তবু ভুল ধরা পড়ে নাই ?

এই চিন্তার জ্বালার সঙ্গে ভূপেন অনুভব করে, বন্ধন আলগা হইযা গিয়াছে। বাহিরে থাকিলে বাড়ি ফিরিবার তাগিদ আগেও ছিল না, যেখানে খুশি যাওয়ার বাধাও ছিল না। শুধু মনে পড়িত বাড়িতে সরমা ও নন্তু, এই দুজন আপনার জন আছে—নিজের ঘরে একটু একা থাকিবাব জন্য মনটা ছটফট করিবার সময়েও যাদের খুশিমতো কাছে আসিবার ও মনোযোগ আকর্ষণ করিবার অধিকার ছিল। মনোযোগ দাবি করিবার এখন কেউ নাই, কিছুই নাই ! জীবনের যে অংশটুকু পরাধীন ছিল, তাও স্বাধীনতা পাইয়াছে।

এই মুক্তির প্রথম প্রতিক্রিয়া, সরমা আর নন্তুর চিন্তা ঠান্ডা হওয়ার আগেই প্রভার কাছে তার বিবাহের প্রস্তাব। বাবুদের মতো এই একটিমাত্র প্রতিক্রিয়ায় মুক্তির উচ্ছ্বাস-উন্মাদনা যেন শেষ হইয়া গিয়াছে। বন্ধন নাই এ অনুভূতিও অভাব বোধের মতো ভোঁতা হইয়া গিয়াছে।

একদিন দুটি পুরানো বন্ধু বহুকাল পরে ভূপেনকে দুঃখের জগতে দুঃখের জীবনে একটু আনন্দ করার আহ্বান জানায়, বলে, এখন তো বাইরে রাত কাটাতে বাধা নেই, এসো না ?

দুজনেই সংসারী, ধীর স্থির হিসাবি মানুষ, একজন সম্প্রতি মেয়ের বিবাহ দিয়া শ্বশুর হইয়াছে। শান্তিপূর্ণ সংসারে নিখুঁত গার্হস্থ্য জীবন তারা যাপন করে। চর্বিস্নিগ্ধ দেহে, বেশভূষা-চালচলনে উগ্র আমোদ-প্রমোদের পিপাসার ইঙ্গিত বা অপচয়ের ছাপ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না।

এখনও ও সব আছে নাকি তোমাদের ?

অজিত একটি ইনশিয়োরেন্স কোম্পানির ম্যানেজাব, ভূপেনের সঙ্গে এককালে তারই বন্ধুত্বের বন্ধন ছিল সবচেয়ে জোরালো। হতাশার স্তিমিত হাসি হাসিয়া সে বলে, মাঝে মাঝে—মাসে দু-তিনরাতের বেশি হয় না ! আগের সে দিন কী আর আছে ভাই, বড়ো একঘেয়ে লাগে, মাঝে মাঝে তাই একটু—

উৎসাহ জাগে না ! ঝড়ের বাত্রির মতো প্রথম যৌবনে কয়েকটি ফুর্তির রাত্রি আসিয়াছিল, অভ্যস্ত হইতে পারে নাই। রজনিব্যাপী বেপরোয়া উল্লাসের চেয়ে রাত্রিশেষের অবসাদের স্মৃতি মনকে আজ বিষণ্ণ করিয়া দেয়। কতকটা অনাবশ্যক অপ্রিয় মুক্তির আরেকটা বড়োরকম প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করিবার উদ্দেশ্যে সে রাজি হয়, অনিচ্ছার সঙ্গে।

সন্ধ্যার পর দোকানের মতো সাজানো ঘরে ঢুকিয়াই মন তার আরও দমিয়া যায়, গেলাসে প্রথম চুমুক দিবার সময় আতঙ্ক জাগে, তিনটি স্ত্রীলোকের সান্নিধ্য ভিতরের অমর অনাহত লাজুক তরুণটিকে পীড়ন করে, জীবনের সময় ও জীবনীশক্তির স্বার্থপব সতর্ক প্রহরীর মতো নিজেই সে এক মুহূর্ত সময় ও একবিন্দু শক্তির অসার্থক অপচয়ের বিবুদ্ধে ক্রমাগত নিজেকে সাবধান করিয়া দিতে থাকে। মাঝরাত্রে যখন পা টলিতেছে, বিশ্বজগৎ হইয়া গিযাছে ফেনা আর বুদবুদ, তখনও নিজের কাছে কৈফিয়ত চাওয়া চলিতে থাকে যে, লাভ কী ? আর আপশোশ করিতে হয যে, হায়, নিজেকে ভুলিবার এত আয়োজনও যদি ব্যর্থ হইল, তবে আর বাঁচা কেন ?

শশীতারা তীক্ষ্ণগলায় গান ধরে,—গাযের ওপর হুমড়ি খেয়ে ভিরমি গেল সে ! সেই সঙ্গে মুহুর্মুহু চোখ ঠারে। একরাত্রির জন্য ভাড়া করা চোখেব ইশারায় সাড়া দেওয়ার জন্যই যেন ভিরমি লাগিয়া ভূপেন পড়িয়া যায়। শশীতারার গায়ে নয়, তাকিযার ওপর। অভ্যাস নাই, বেহিসাবি মদ গিলিতে বন্ধুবা অনেক বারণ করিয়াছিল। অচেতন ভূপেনকে উদ্ভট ভঙ্গিতে পড়িযা থাকিতে দেখিয়া তারা সগর্বে ভাবে, আমরা ওর মতো নই, আমাদের মাত্রাজ্ঞান আছে, ফুর্তি করতে বসেও আমরা সংযম হারাই না। একটু রাগও তাদের হয়। বড়ো একঘেয়ে জীবন, ফুর্তি কোনোদিন জমে না, ভূপেন সঙ্গে থাকায় আশা করিয়াছিল হয়তো আজ জমিবে। রাত্রির পর রাত্রি বৃথা গিয়াছে, আরেকটা বাত্রি আজ ব্যর্থ হইয়া গেল। এখন আবার অন্য একটি রাত্রিব ভরসায় বুক বাঁধিতে হইবে।

স্বর্ণ মোটাসোটা মানুষ, একবার সিঁড়ি দিয়া উঠিতেই তার হাঁপ ধরিয়া যায়। কাজ করাব বদলে সে করে সংসার পরিচালনা। তার মনটা ভালো, মাথায় বুদ্ধি আছে, স্বভাবটি মিশুক ও মিষ্টি। সবমাকে সেও স্নেহ করিত। সরমার জন্য মন কেমন করার সঙ্গে ভূপেনকে সহানুভূতি দেওযার জন্য উদ্যত হইয়া থাকিয়াও সুযোগ না পাইয়া সে বড়ো দমিয়া গিয়াছিল। তারপর ভূপেন এই সব কাণ্ডকারখানা শুরু করিয়া দেওয়ায় ভয়ে-ভাবনায় সে যেন দিশেহারা হইয়া গেল।

কেবল ভূপেনের জন্য নয়, সংসারকে স্বর্ণ ভালোবাসে, তার অখণ্ড নিযমানুবর্তী সুখের সংসার। সরমা এ সংসারের একটা দিক ভাঙিয়া দিয়া চলিয়া গিয়াছে, কিন্তু মরণের বিবুদ্ধে তো নালিশ নাই। সরমার মতো আরেকজনকে আনিয়া সে ভাঙন জোড়া দেওয়ার আশা ইতিমধ্যেই স্বর্ণের মনে উঁকি দিতে আরম্ভ করিয়াছে। প্রথমে কিছুকাল শুধু সমবেদনা জানাইয়া তারপর ধীরে ধীরে নতুনভাবে জীবন আরম্ভ করিবার উৎসাহ জাগাইয়া তুলিবে, এই ছিল স্বর্ণের পরিকল্পনা। ইতিমধ্যে একদিন কথায় কথায় সে ভূপেনকে বলিয়াও ফেলিয়াছে : বুড়ো হয়েছ বোলো না ঠাকুরপো। বিয়াল্লিশ বছর এমন কী বয়স মানুষের !

সরমার পরিবর্তে আরেকজনকে আনা যায় কিন্তু ভূপেন যদি নিজের সঙ্গে সংসারকেও ধ্বংস করিতে বসে, তবে তো কোনো উপায় থাকিবে না।

উপেনের উপার্জন কম, কোনো মাসে সে সংসারে সামান্য খরচ দেয়, কোনো মাসে দেয় না। সে জন্য কিছুই আসিয়া যায় নাই। সরমা কোনোদিন স্বর্ণকে তার গৃহিণীর আসন হইতে সরাইয়া নিজে কর্তৃত্ব করার চেষ্টা করে নাই। কেবল ভূপেনের সেবা আর সুখসুবিধার দায়িত্বটা সে নিজের আয়ত্তে রাখিয়াছিল, তাও স্বর্ণের প্রতিনিধির মতো, স্বাধীনভাবে নয়। সমগ্রভাবে সংসারের ভার ছিল স্বর্ণের। টাকার প্রশ্ন আজও উঠিবে না, স্বর্ণ জানে। যার টাকাতেই সংসার চলুক, তাকে ছাড়া সংসার চলিবে না। নিজের কর্তৃত্ব করার সাধ মিটাইতে ভূপেনের বড়ো ভাইয়ের স্ত্রী হওয়ার অধিকার খাটাইয়া গায়ের জোরে সে সংসারের গৃহিণীপদ অধিকার করে নাই, সংসার গড়িবার ও চালাইবার ভারটা আপনা হইতে তার জুটিয়া গিয়াছে। কিন্তু ভূপেন যদি বিগড়াইয়া যায়, সংসারে যদি তার মন না থাকে, সংসার তো তবে আপনা হইতেই ভাঙিয়া পড়িবে, দেখা দিবে অভাব, বিশৃঙ্খলা আর অশান্তি।

ভয়ে-ভাবনায় ব্যাকুল হইয়া একদিন সে প্রভার বাড়ি গেল। প্রভাকে সে তেমন পছন্দ করে না, ভূপেনের সঙ্গে তার মেলামেশাকে সে কোনোদিন ভালো চোখে দেখিতে পারে নাই। স্পষ্ট কিছু মনে না হইলেও মনটা তার চিরদিন খুঁতখুঁত করিয়াছে। কিন্তু এই বিপদের সময় অত ভাবিলে চলিবে কেন !

সমস্ত শুনিয়া প্রভা বলিল, কী আশ্চর্য ব্যাপার ! মাথা নিশ্চয় খারাপ হয়ে গেছে ভূপেনবাবুর। এই বয়সে এ সব কী !

স্বর্ণ বলিল, বয়স আর এমন কী বেশি ?

প্রভা মুখভার করিয়া বলিল, তা বইকী, দেওরটি আপনার এখনও ছেলেমানুষ আছে।

স্বর্ণ বলিল, হঠাৎ ঘা খেলে মানুষের এ রকম হয় ভাই। কেউ সন্ন্যাসী হয়ে যায়, কেউ মদ ধরে। এখন ঝোঁকটা কেটে গেলে বাঁচি। আমার কিছু বলতে তো সাহস হয় না, তুমি যদি একটু চেষ্টা কর, সামলে যেতে পারে।

স্পষ্টভাবে স্বর্ণের এ অনুরোধ জানাইবার প্রয়োজন ছিল না, প্রভাও সেই কথাই ভাবিতেছিল। এ সব ব্যাপার সে ভালো বুঝিতে পারে না, মানুষের বেহিসাবি উন্মাদনা, আবেগের অসংযম। হিস্টিরিয়ার সঙ্গে তার পরিচয় আছে, অনেকের চিকিৎসাও করিয়াছে। ভূপেন সত্যসত্যই পাগল হইয়া গেলে সে তার মানে বুঝিতে পারিত, হয়তো চিকিৎসার ব্যবস্থায় সাহায্যও করিতে পারিত। একজন ধীর স্থির শান্ত মানুষের মধ্যে এ সব পাগলামি কী করিয়া আসে কে জানে !

মাঝখানে ভূপেনের সঙ্গে বার দুই তার দেখা হইয়াছে, ভূপেন সহজভাবেই তার সঙ্গে কথা বলিয়াছে, ভিতরে তার কী চলিতেছে কিছুই বুঝিতে পারা যায় নাই। প্রভার তাও ভালো লাগে নাই। সে আশা করিয়াছিল, তার সেদিনকার খাপছাড়া প্রস্তাব সম্বন্ধে আবার সে কথা তুলিবে—বিশ বছরের ভাবুক ছেলের মতো উচ্ছ্বাসের আমদানি না করিয়া সহজভাবে আলোচনা করিবে ও বিবেচনা করিবে। একটা বুঝাপড়ার জন্য প্রভা সত্যসত্যই অস্থির হইয়া উঠিয়াছিল। ভূপেনের সঙ্গে কখনও কোনো বিষয়ে তার মনোমালিন্য হয় নাই, তাদের সম্পর্কে কোনোদিন এতটুকু ভুল বোঝার স্থান ছিল না।

জীবনে অনেক রকম বিচিত্র অভিজ্ঞতা প্রভা সঞ্চয় করিয়াছে, তার মধ্যে সবচেয়ে অভিনব ভূপেনের সঙ্গে দিনের পর দিন সহজ ও গভীর অন্তরঙ্গতা বজায় রাখিয়া চলিবার অভিজ্ঞতা। মানুষের অন্ধ স্বার্থপরতা আর অফুরন্ত দাবির সঙ্গে তো ভালোভাবেই পরিচয় ছিল প্রভার, ভূপেন কোনোদিন অন্যমনেও তার কাছে মেলামেশার বেশি কিছু চাহিবে না, প্রথমে এ কথা তার কল্পনাতেও ছিল না। কল্পনা করিতেও চায় নাই। একটি অধীরতার সঙ্গে অন্য কল্পনাই বরং সে আরম্ভ করিয়াছিল, কবে কথা বলিতে বলিতে ভূপেন তার হাত ধরিয়া কাছে টানিয়া নিবে। তারপর দিন সপ্তাহ মাস কাটিয়া গিয়াছিল, মাঝে মাঝে ভূপেনের চোখে সে দেখিয়াছিল ক্ষুধা আর কাতরতা, কিন্তু কথায় সে কিছু

বলে নাই, ব্যবহারে কিছু বুঝিতে দেয় নাই। তখনও প্রভা বিশ্বাস করিতে পারে নাই, তাদের সম্পর্কে এই সীমা বজায় রাখিয়া জীবন কাটাইয়া দিতে ভূপেন প্রস্তুত হইয়াছে, মানুষের পক্ষে যে সংযম সম্ভব। পুরুষ অবুঝ, খেয়ালি তাদের প্রকৃতি, অস্থির তাদের অগভীর সংকীর্ণ চিত্ত, দুদিনের বেশি কামনাকে তাবা চাপিয়া রাখিতে পারে না। প্রভা তখন জানিত না, ভূপেনের দিকে আত্মসংযমের প্রশ্ন ছিল না, কারণ আত্মহারা হওয়াব প্রেরণাই তাব মধ্যে ছিল অনুপস্থিত। প্রভাকে সে পাইবে না, যতদিন সরমা বাঁচিয়া আছে প্রভাকে পাওয়ার স্বপ্ন দেখাও অর্থহীন, এই ছিল তার কাছে চরম সত্য। এবং এই সত্যকেই সে মানিয়া লইয়াছিল। মেলামেশায় পাছে বাধা সৃষ্টি হয়, প্রভা পাছে দূরে সরিয়া যায়, এই ছিল তার ভয়। একটা নির্দিষ্ট সীমা সে তাই কোনোদিন অতিক্রম করে নাই।

এদিকে অসহিষ্ণু প্রভা পড়িযা গিয়াছিল ধাঁধায়। এ অভিজ্ঞতা ছিল তার অভিজ্ঞতার বাহিরে। পুরুষ ঘনিষ্ঠ হয় যতখানি হওয়া সম্ভব, বছর পার হইয়া যায় প্রকাশ্যে আর নির্জনে কাছাকাছি হওয়ার ভূমিকা করিয়া, অথচ কিছুই ঘটে না ! এ কোন দেশি সম্পর্ক নারী ও পুরুষের ? কিছুদিনের জন্য তখন প্রভার বড়ো কষ্টকর মানসিক বিপর্যয়ের মধ্যে কাটিয়াছিল। জীবনের অনেক সীমাহীন সম্ভাবনার দুর্বোধ্য রহস্যময় অনুভূতি তাকে কখনও ব্যাকুল করিয়া রাখিত, কখনও সে অনুভব কবিত খাপছাড়া আনন্দ, বিষাদের চাপে জীবন কখনও হইয়া উঠিত দুর্বহ। বিষাদেব পব আসিত ক্ষোভ। দেহমন তার যেন জ্বালা করিতে থাকিত। কোনোদিন ভূপেনকে অতিরিক্ত প্রশ্রয় দিত, কোনোদিন করিত অপমান। কোনো রকমে মানুষটাকে একবার জয় করিতে পারিলে তাকে কী শাস্তি দিবে ভাবিতে ভাবিতে তার নিদ্রাহীন রাত কাটিয়া যাইত।

একদিন শ্রান্তিব-ছলে ভূপেনের কাঁধে মাথা রাখিয়া কয়েক মিনিটে সে কযেকটা যুগ কাটাইয়া দিয়াছিল, প্রতি মুহূর্তে পরবর্তী মুহূর্তেব অঘটন প্রত্যাশা করিয়া। নিজের সেই স্পষ্ট নির্লজ্জ পাশবিক অভিযানের কথা ভাবিলে আজও প্রভার গায়ে কাঁটা দিয়া উঠে। ভূপেন শুধু সন্তর্পণে তার মাথায় ধীরে ধীরে হাত বুলাইয়া দিয়াছিল। অনেকক্ষণ পরে ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা কবিযাছিল, একটু ভালো লাগছে প্রভা ?

কিছুই যেন অপ্রত্যাশিত নয়, খাপছাড়া নয়। হঠাৎ দুর্বলতা বোধ করিয়াছে, মাথা ঘুরিয়া উঠিয়াছে, তার কাঁধে মাথা রাখিয়া তাকে আশ্রয কবিয়া প্রভা একটু বিশ্রাম করিবে বইকী। সংকোচ বোধ কবিলেই যেন প্রভার অন্যায় হইত।

তাবপর হইতে প্রভা তাদের সম্পর্ককে স্বীকার করিযা লইযাছে। অপমানের জ্বালাটুকু পর্যন্ত আব বোধ কবে নাই।

দুপুববেলা স্বর্ণ প্রভাব কাছে গিয়াছিল, বিকালে প্রভা এ বাড়ি আসিল। ঘণ্টা দুয়েকের মধ্যেই সে মনস্থির করিয়া ফেলিয়াছে। মেয়েদেব সঙ্গে দুয়েকটি কথা বলিয়াই সে উপরে উঠিয়া গেল। ভূপেন এখনও শুইযা আছে শুনিয়া একটু যে দ্বিধা মনে ছিল তাও সে এবার বাতিল করিয়া দিল।

রোগী দেখিয়া দেখিয়া প্রভার এ সব কেমন অভ্যাস হইয়া গিয়াছে। রোগীর বিছানায় বসার মতো সে ভূপেনের বিছানায় বসে, তাপ নেওয়ার মতো কপালে হাত রাখে, নাড়ি দেখার মতো তার হাত ধরিয়া মুমূর্ষুকে ভরসা দেওয়ার মতো হাসি হাসে।

ছি, তোমার না চল্লিশ বছর বয়স হয়েছে ? এ সব ছেলেমানুষি কেন আবার ?

অনুযোগ দিয়া একটি কথাও বলিবে না ভাবিয়াছিল, অনেকদিন অভ্যাসে আপনা হইতে মনের প্রধান নালিশটা অনুযোগের ভাষায় বাহির হইয়া গেল। চিকিৎসার প্রথম কিস্তি হিসাবে, আজ যাচিয়া ভূপেনকে অনেক কিছু দিবে ঠিক করিয়াছিল মনে পড়ায় ছোটো ছেলেকে আদর করার মতো ছোটো একটি চুমু দিল।

ভূপেন কিছুই করিল না, বোকার মতো শুধু কৈফিয়ত দিয়া বলিল, এই প্রথম প্রভা। বন্ধুরা জোর করে টেনে নিয়ে গেল। তুমি তো জানই ও সব অভ্যাস আমার নেই।

অভ্যাস হতে কতক্ষণ !

না, সে ভয় নেই। এমন বিশ্রী লাগছে কী বলব তোমায়। ওরা যে কী আনন্দ পায় ওরাই জানে !

গতরাত্রির বেপরোয়া উল্লাসের চেয়ে অবসাদের স্মৃতিই ভূপেনকে বিষণ্ণ করিয়া রাখিয়াছে। কিছুই ভালো লাগে নাই। নিজেই সে যে সময় আর জীবনীশক্তির অসার্থক অপচয়ের এমন স্বার্থপর সতর্ক প্রহরী হইয়া দাঁড়াইয়াছে, কাল রাত্রির আগে কখনও খেয়াল হয় নাই। গায়ের জোরে বন্ধুদের সঙ্গে পাল্লা দিয়া চলিতে গিয়া অচেতন হইয়া পড়িয়া গিয়াছিল, এও কম লজ্জার কথা নয়। অভ্যাস নাই বলিয়াই কি তার সহ্য হয় নাই ? এখনও দেহমনের অবস্থা তার শোচনীয় হইয়া আছে। সকালে একবার এবং সারা দুপুর ঘুমানোর পর বিকালে আরেকবার স্নান কবিয়াও মনে হইতেছে বাসি বেলফুলের গন্ধ যেন এখনও বাতাসে লেপটিয়া রহিয়াছে।

দুজনে অনেক কথা হয়,—অনেক। একযুগ আগে যে কথা বলা চলিত সেগুলি অবশ্য মনের মধ্যে ভিড় করিয়াই থাকে, দুজনে শুধু উচ্চারণ করিয়া যায় কথাগুলির সময়োপযোগী অনুবাদ। অনুবাদের ভাষা অতি সুবোধ্য, কিন্তু শব্দগুলির মানে এত কম যে কিছু যেন প্রকাশ করাই কঠিন। তবু কথা বলিতে বলিতেই ভূপেনের জিভেব বিস্বাদ জড়তা কাটিযা যায়। বাসি বেলফুলের গন্ধ চাপা পড়িয়া যায় প্রভার পরিচিত সেন্টের গন্ধে, বসা-সর্দির মতো মস্তিষ্কের ভোঁতা টসটসে অস্বস্তিবোধ কাটিয়া যায় প্রভার ঠান্ডা হাতের স্পর্শে।

সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনাইয়া আসিলে প্রভা বলিল, এখন যাই, একটা কেস আছে। চারটের সময় যাওয়ার কথা, সন্ধে হয়ে গেল।

উঠি উঠি করিয়াও প্রভা একটু দেরি করে। ছোটো ঘড়িটিব সেকেন্ডেব কাঁটা চলিতেছে দেখিযাও কানের কাছে ধরিয়া রাখিয়া পরীক্ষা করে ঘড়িটার প্রাণ আছে কিনা। তবু ভূপেনের মনে পড়ে না প্রভা আজ যাচিয়া আসিয়া ধরা দিয়াছে, তার অনেকদিন আগেকার প্রায় চাপা-পড়া প্রস্তাবেব সক্রিয জবাবের মতো বিদায় নেওয়ার সময় অন্তত তাকে একটু গ্রহণ করা তার একান্তভাবে উচিত। চিরদিন সে আসে আর চলিয়া যায়। আসার মধ্যে প্রভা নিজেই আজ নতুনত্ব আনিয়াছে, যাওযার মধ্যে বৈচিত্র্য আনিবার দায়িত্বটা তার। কাল সন্ধ্যায় দুঃখীর বরফ-শীতল পানীয়ে প্রথম চুমুক দিয়া উষ্ণতা বোধ কবার মতো নতুন সম্ভাবনার উত্তেজনায় ভূপেন চাঙ্গা হইয়া উঠিয়াছে, কিন্তু ভবিষ্যতের দিন ও রাত্রিব্যাপী নিবিড় মিলনের কল্পনায় ছড়ানো সে সম্ভাবনার সূচনা যে আজ এই মুহূর্তে প্রভাকে একটু আদর করায়, সেটা খেয়াল না হইলে ভূপেন কী করিবে ! চিরদিনের প্রথাতেই সে প্রভাকে বিদায় দিল।

রাত দশটার সময় প্রভা ফোন করিল।

রাজি তো হলাম, আমার কিন্তু ভয় করছে।

কীসের ভয় ?

ঠিক ভয় নয়, কেমন যেন ভাবনা হচ্ছে।

কীসের ভাবনা ?

কাল সকালে একবার এসো। বলিয়া প্রভা কথা বন্ধ করিয়া দিল।

চার

দুজনের বাড়িতেই ব্যাপারটা মোটামুটি অনুমান করিয়া সকলে শঙ্কিত ও ঈদ্‌গ্রীব হইয়া রহিল। ছেলে-বউ মারা যাওয়ার পরেই হঠাৎ ভূপেন যেভাবে প্রভার দিকে ঝুঁকিয়াছিল, তাতে বউদির ভয়ের

সীমা ছিল না। মনে হইয়াছিল, শোক যে ভূপেনের হয় নাই সরমা ও নন্তুর জন্য, তার কারণও বুঝি এই। রুদ্ধনিশ্বাসে সে প্রতীক্ষা করিয়াছিল, কী হয় কী হয়। কিন্তু কিছুই তখন হয় নাই। প্রভার জন্য ভূপেনের ব্যাকুলতা কমিয়া গিয়াছিল, ছেলে-বউয়েব জন্য সে কাতর হইয়া পড়িয়াছিল শোকে। প্রভার সঙ্গে ভূপেনের দেখাসাক্ষাৎও যেন কমিয়া গিয়াছিল আগের চেযে। তারপর কোথায় এক বানিকে সন্তান প্রসবের জন্য সাহায্য করিতে গিয়া প্রভা কিছুদিন এক রাজবাড়িতে বাস কবিয়া আসিল। তারপরেও কিছু ঘটিল না। ধীরে ধীরে সকলের দুর্ভাবনা কাটিয়া গেল। বউদি কোমব বাঁধিযা সরমাব অভাব পূরণ করিবার চেষ্টা আরম্ভ করিয়া দিল। দিদির ফিট পর্যন্ত একটানা অনেকদিন স্থগিত হইয়া রহিল।

হঠাৎ দুজনে আবার কী আরম্ভ করিয়া দিয়াছে দ্যাখো ! একদিনে যার ছেলে-বউ মরিয়া যায়, জানাশোনা একজন লেডি ডাক্তারকে তাড়াতাড়ি বিবাহ করিয়া ফেলাটা তার পক্ষে বড়োই অশোভন হয়, এটা খেযাল করিযা কি দুজনে চুপ কবিযা ছিল এতকাল ?

প্রভা বউ হইয়া এ বাড়িতে আসিলে কী অবস্থা দাঁড়াইবে ভাবিতে গেলেও বউদির বুক ধড়ফড় কবে। এমনই প্রভার যা দেমাক, বাড়িব মানুষগুলিকে সে এমনি যে রকম অবজ্ঞা কবে, তাতে একেবারে গৃহিণী হইযা আসিয়া জুড়িযা বসিলে মানুষকে সে কি আর টিকিতে দিবে ? বিবাহ করার সাধ হইয়া থাকে সরমাব মতো আরেকটি ভীরু নরম বউ আনুক, কর্তালি করাব অভ্যাস যাব নাই, সব বিষয়ে যে বউদিব মুখ চাহিয়া থাকিবে। প্রভাকে কেন ? প্রাণ দিযা এত যে সেবা কবে ভূপেনেব, তাকে জব্দ কবাব জন্য প্রভাকে কেন ?

এদিকে প্রসন্ন ভয়ে ভয়ে বোনকে জিজ্ঞাসা করে, ডাক্তাবি বুঝি ভালো লাগছে না প্রভা ?

ভালো লাগছে না ? কে বললে তোমায ?

দু-একদিন পরে প্রসন্ন আবাব বলে, একটা প্রফেশন নেওযাব পর সেটা ছেড়ে দিলে মেয়েরা সুখী হতে পারে না প্রভা। ভারী অগৌবরের বিষয হয। পুরুষদেব সঙ্গে সমান অধিকার চায, অথচ স্বাধীনভাবে থাকবাব সুযোগ পেলেও নিজেবাই সেটা বজায় রাখতে পারে না। সাধে কী পুবুষ জাত মেয়েদের দাবিযে রেখেছে !

প্রভা মৃদু হাসিযা বলে, তুমি যেমন বউদিকে রেখেছ ?

সকলেব বিপদ হইয়াছে, এখনও সবটাই নিছক সম্ভাবনাব ব্যাপার, স্পষ্ট করিযা ভূপেন ও প্রভা কিছু ঘোষণা কবে নাই। স্পষ্ট করিয়া তাই তাদের কিছু বলাও যায় না। নিজেব চাকরির পঁচাত্তব টাকায় সংসার চালানোর কথা ভাবিলে প্রসন্নের কপাল ঘামিয়া ওঠে। প্রথম প্রথম প্রভা অবশ্য সাহায্য করিবে, কিন্তু সে আব কতদিন। তার ছেলেমেযে হইবে, নিজের সংসাব গড়িযা উঠিবে, তখন কি আর মনে থাকিবে বাপ দাদা ভাইপো ভাইঝির কথা ? অথচ স্পষ্ট করিয়া ওবা কিছুই বলিবে না। এ বকম অবস্থাব মধ্যে মানুষ থাকিতে পারে !

অন্যমানুষের যারা বউ তাদের চিকিৎসা করিযা শ্রান্ত হইয়া প্রভা বাড়ি ফেবে, নিজেব ঘরের নির্জনতায় পুরুষালি ভঙ্গিতে ইজিচেয়ারের হাতলে পা তুলিয়া চিত হইয়া নিজেব বধূ-জীবন কল্পনা করে। এমনই বিষণ্ণ শ্রান্তির সময় ভূপেনের বুকে মাথা রাখিয়া বিশ্রামের কল্পনায় সর্বাঙ্গে তার শিহরন জাগে, নিশ্বাস জমা হইয়া দীর্ঘ অতৃপ্তির মতো মুক্তি পায়। কিন্তু কত ভয় আর ভাবনাও যে বুক তার দুরুদুরু কাঁপাইয়া দেয় !

ভূপেনের দিক দিয়া তার ভয়ের কিছু নাই, সে তার কোনো ইচ্ছায় কোনো কাজে বাধা দিবে না, কিন্তু যে পরিবর্তনগুলি অপরিহার্য, কারও ইচ্ছা বা অনিচ্ছার উপর যে যোগাযোগগুলি নির্ভর

করিবে না ? যখন খুশি বাহির হইয়া গিয়া যখন খুশি সে ফিরিয়া আসে, দিবারাত্রি বাহিরে কাটাইলেও কেহ জিজ্ঞাসা করিতে সাহস পায় না সে কোথায় ছিল। আপনজনের দিকে ইচ্ছা হইলে তাকায়, ইচ্ছা না হইলে তাকায় না। ঘরের দরজার মোটা পর্দাটি টানিয়া দিলে সে একা হইয়া যায়, পর্দা সরাইয়া ঘরে উঁকি দিবার সাহস পর্যন্ত কারও হয় না। নারী ও শিশুর মঙ্গলের জন্য সমিতি গড়িয়া মানুষের শ্রদ্ধা অর্জন করে। অসংখ্য অভ্যাসের ভেলায় ভাসিয়া চলে জীবন স্রোতে। এ সব যদি সে বজায় রাখে, ভূপেনের বউ হওয়ার অর্থ কী ? আর এই যে সব বিচিত্র উপকরণে জীবন গড়িয়া তুলিয়াছে, এগুলি ছাঁটিয়া ফেলিলে ভূপেনের বউ হইয়া তার লাভ কী ? শুধু অবসর মিলনের জন্য তো বিবাহের দরকার হয় না।

অথচ বিবাহ ছাড়া মিলনও তাদের বিস্বাদ হইয়া যাইবে। প্রভা ভালো করিয়াই তা জানে। তার নিজের জন্য হয়তো নয়, ভূপেনের জন্য। এই রকম প্রকৃতি ভূপেনের। শুধু প্রভাকে পাইলে তার চলিবে না, প্রভার জীবনও তার চাই।

প্রভা ঘরের চারিদিকে তাকায়। এ ঘর ছাড়িয়া ভূপেনের বাড়িতে একটা ঘরে তাকে বাস করিতে হইবে। বাহিরে বারান্দায় গিয়া প্রভা সংসারের কলরব শোনে, আপনজনের চলাফেরা চাহিয়া দ্যাখে। ভূপেন যেমন তার বাড়ির সংসারটির কর্তা, সেও তেমনি এই সংসারের কর্ত্রী। তার টাকায় তার নির্দেশে এই সংসার চলে। এবার তাকে গিয়া চালাইতে হইবে ভূপেনের সংসার। সে টাকা পাঠাইবে কিন্তু তার এই সংসারে কর্তৃত্ব করিবে অন্য একজন। তার প্রচলিত নিয়ম আর ব্যবস্থাগুলিও হয়তো বাতিল হইয়া যাইবে দুদিনের মধ্যে।

কেবল নিজের নিজের বিচার-বিবেচনাই নয়, আসন্ন বিপদের মতো তাদের মিলনের সম্ভাবনায় বাড়ির মানুষের মধ্যে যে ভয় জাগিয়াছে সেই ভয়ের উত্তেজনা সঞ্চারিত হইয়াও তাদের দমাইয়া দেয়। একটা রাত্রিও তাদের দূরে কাটাইতে ইচ্ছা করে না, ভিন্ন দুটি বাড়িতে ভিন্ন দুটি ঘরে রাত জাগিয়া তারা পরস্পরের জন্য ছটফট করে। কিন্তু তাড়াতাড়ি বিবাহটা সারিয়া ফেলিবার তাগিদও কোনো পক্ষ হইতে আসে না। আলোচনা সেদিন যতটুকু আগাইয়াছিল সেইখানেই থমকিয়া থাকে। আর তাদের দূরে থাকিবার প্রয়োজন নাই, এইটুকু বুঝাপড়া করিয়াই যেন তারা একেবারে নিশ্চিন্ত হইয়া গিয়াছে। আর কিছু বলিবার বা করিবার প্রয়োজন যেন নাই। কাছাকাছি আসিলে মাঝে মাঝে বরং মনে তাদের এই অস্বস্তিই জাগিয়া উঠে যে, অন্যজন হয়তো হঠাৎ বলিয়া বসিবে, একটা দিন তবে এবার ঠিক করে ফেলা যাক ?

মেজাজ দুজনেরই বিগড়াইয়া যাইতে থাকে। কাম্য মিলনকে ঠেকাইয়া রাখিতেই ধৈর্য ও সহিষ্ণুতা তাদের ফুরাইয়া যায়, অতি তুচ্ছ কারণে সমস্ত জগতের উপর রাগে তাদের গা জ্বালা করিতে থাকে। পরামর্শ করিয়া তারা যদি বিবাহ পিছাইয়া দিত, কোনো কথা ছিল না। দীর্ঘ প্রতীক্ষার কথা ভাবিয়া মন শুধু তাদের ব্যাকুল হইয়া উঠিত। এখন তাও সম্ভব নয়। পরামর্শ করিতে হইলে এখন সবচেয়ে নিকটবর্তী শুভদিনটিতে বিবাহ চুকাইয়া ফেলিবার পরামর্শই করিতে হয়। তাই যে উদ্ভট অবস্থা তারা সৃষ্টি করিয়াছে সেই অবস্থারই জের টানিয়া চলিতে চলিতে দম যেন তাদের ফুরাইয়া যাইতে চায়।

দু-বাড়ির লোকেরাও ভীত ও সন্ত্রস্ত হইয়া থাকে। সংসারের খরচের জন্য টাকা চাহিতে গিয়া বোনের কাছে অপমানিত প্রসন্ন কিছুক্ষণের জন্য এমন কথাও ভাবে যে, এর চেয়ে নিজের পঁচাত্তর টাকাতে সংসার চালানোর চেষ্টা করাও ভালো। ভূপেনের বাড়িতে ছেলেমেয়েদের একটু সর্দি হইলে, মেয়ে-বউয়ের একটু মাথা ধরিলে প্রভাকে ডাকা হইত, প্রভাও ডাকিলেই যাইত। এখন বউদির খোকার আটানব্বই পয়েন্ট এক জ্বরের জন্য ব্যাকুলভাবে তাকে ডাকিলে ফোনেই সে খোকাকে ঘণ্টা দুই চৌবাচ্চায় ডুবাইয়া রাখিবার উপদেশ দেয়, অনু মাথার যন্ত্রণায় ছটফট করিতেছে শুনিয়া বলে যে

একটা পেরেক যেন তার তালুতে ঢুকাইয়া দেওয়া হয়। পেরেকটা এমনি না ঢুকিলে যে হাতুড়ি ব্যবহার করা চলিবে, এটুকু বলিয়া দিবার ইচ্ছাটা পর্যন্ত সে সংবরণ করিতে পারে না।

বউদি কাঁদো কাঁদো হইয়া ভূপেনের কাছে নালিশ জানায়, প্রভা আমায় এমনি করে অপমান করবে ঠাকুরপো ?

ভূপেন বলে, বেশ করেছে। ফোন কবতে গিয়েছিলে কেন ? বান্না হয়েছে ?

বউদি বলে, এই হল।

ভূপেন গর্জন করিয়া উঠে, এই হল ! আপিস যাব না আমি ?

বউদি ভয়ে ভয়ে বলে, আপিস আছে নাকি ? আমি ভাবছিলাম আজও ছুটি। কিছু তো বলোনি ঠাকুরপো ?

বলতে হবে কেন ?

আপিসের কথা ভূপেনের নিজেরও মনে ছিল না। এতক্ষণে মনে পড়িযাছে, সাড়ে দশটাব সময। কবে ছুটি শেষ হয, কখন আপিসের বেলা হয়, মনে কবাইযা দিবার কেউ নাই। সমস্ত জগৎ যেন তার সঙ্গে শত্রুতা আরম্ভ করিয়াছে।

সরমা যেন জীবনের আধারটা তোবড়াইয়া রাখিয়া গিয়াছে। কোনোমতে নিজেকে খাপ খাওয়াইতে পারিতেছে না, কোথাও থাকিতেছে ফাঁক, কোথাও লাগিতেছে খোঁচা।

খাইতে বসিয়া তাড়াতাড়িতে খাওযাটা ভূপেনের বেশি হইযা যায়। সকলে যেন তাকে পীড়ন করার জন্যই আজকাল বেশি বেশি এটা খাও ওটা খাও বলে। সবমাই শুধু তাব খাওয়াব হিসাব জানিত, সবমাই শুধু সাহস করিযা তাকে বলিতে পাবিত, রাবড়িটা থাক, ও বেলা খেয়ো। ভবপেটে দুবার সিঁড়ি ভাঙিয়া হাঁপ ধরিয়া গেলে গাড়িতে উঠিবার সময় হঠাৎ তার মনে পড়িয়া যায়, এও অন্যায়। দরকারি কিছু ফেলিয়া ঘরের বাহির হওয়ার আগেই সরমাব মতো কেউ মনে পড়াইয়া দেয় না। সকলে মিলিয়া এমনভাবে তার মনটা বিগড়াইয়া দিযাছে যে দুবাব সিঁড়ি ভাঙার আগে খেয়ালও হয় না, সে একটা হুকুম দিলেই দশবার সিঁড়ি ভাঙিবার অনেক লোক তার বাড়িতে আছে।

গাড়ির চলনটা পর্যন্ত খাপছাড়া মনে হয়। ছোকরা চালকটির ছাঁটা ঘাড়ে অনেক উঁচু পর্যন্ত চামড়া বাহির হইয়া আছে। জগতের সমস্ত মানুষেব উপব এতক্ষণ যে ক্রোধ ও বিরক্তি ভূপেনের মনে গুমরাইতেছিল, এই ছাঁটা ঘাড়ের ঔদ্ধত্য যেন তাব সবটুকু আকর্ষণ কবিযা নেয়।

গোরুর গাড়ি চালাচ্ছ নাকি ?

গাড়িব স্পিড বাড়িবামাত্র কিন্তু আতঙ্ক জন্মে। বাস্তায মানুস ও গাড়ির ভিড, যদি অ্যাকসিডেন্ট ঘটিয়া যায় ?

কত জোরে চালাচ্ছ ? মাথা খারাপ নাকি তোমাব ?

গাড়ি আস্তে চলিতে থাকে। ছাঁটা ঘাড় হইতে ভূপেন যেন চোখ ফিরাইতে পারে না। একবার জোরে, একবার আস্তে—ছাঁটা ঘাড়ের ও পাশে কি হাসি ফুটিযাছে ছোকরাব মুখে ?

আপিসে ঢুকিবামাত্র কিন্তু ভূপেন গভীর আরাম বোধ করে। এখানে কোনো পরিবর্তন নাই। কোনো নিয়ম, কোনো বন্ধন, কোনো দায়িত্ব এখানে শিথিল হয় নাই, নতুন রূপ নেয় নাই। গভীব স্বস্তির সঙ্গে ভূপেন ঘণ্টা বাজায়, কলম নাচায়, নাম সই কবে, ধমক দেয়, পরামর্শ করে, প্রায় সমবয়সি ও প্রায় সমপদস্থ কর্মচারীর সঙ্গে ইয়ার্কি দেয়।

আপিস হইতে বাহির হইয়া আপিসের বাহিরের বিপর্যস্ত জীবন ভালো করিয়া তাকে নাগালের মধ্যে পাওয়ার আগেই সে সোজা গিয়া হাজির হয় প্রভার কাছে।

ডাক্তারি ব্যাগের মুখ আটকাইয়া প্রভা বলে, আমি যে বেরিয়ে যাচ্ছি ? ডেলিভারি কেস—এখুনি যেতে হবে। কী ছেলেই বিয়োতে পারে বউগুলো। আর যেন তাদের কাজ নেই।

প্রভাকে বড়ো শ্রান্ত মনে হয়।

কতকাল থেকে ছেলে বিয়োনো দেখছি ! জন্মেই ছেলেগুলো কাঁদে—না কাঁদলে হয়। আমার কী মনে হয় জানো ? একটা ছেলে জন্মে যদি একটু হাসত !

তোমার ছেলে হয়তো—

প্রভা চোখ বড়ো বড়ো করিয়া বলে, আমার ছেলে ? ও সব পাবে না আমার কাছে। সময়মতো ছেলে হলেই টিকতাম কিনা সন্দেহ, এই বয়সে ছেলে বিয়োতে হলেই হয়েছে।

প্রভা ডাক্তার। প্রভা সব জানে।

ভূপেন স্তব্ধ হইয়া বসিয়া থাকে। আবার এক অন্ধ আশঙ্কা তার ভীরু মনের গভীরতায় লাফ দিয়া ঠেলিয়া উঠিতে থাকে। প্রভা সরমার অভাব মিটাইতে পারিবে না। প্রভার কাছে সে তা চায় না। কিন্তু নন্তুকেও সে ফিরিয়া পাইবে না ? নন্তুকে আনিয়া দিতে হইলে নিজেকে প্রভার মরিতে হইবে ?

আট বছর প্রভার সঙ্গে যে সম্পর্ক সে মানিয়া আসিয়াছে, যার মধ্যে সে পাইয়াছে মনের বিশ্রাম, জীবনের বৈচিত্র্য, কল্পনার আশ্রয়, তার সমাপ্তির সম্ভাবনাতেই ভবিষ্যৎ তার কাছে কেমন যেন নীরস হইয়া গিয়াছে। প্রভার সঙ্গে এক বাড়িতে দিন আর এক শয্যায় রাত্রি কাটানোর কল্পনা পর্যন্ত তেমন উল্লাস ও উত্তেজনা জাগাইতে পারিতেছে না। নন্তুর মতো আব একজনকে পাওয়াব আশা প্রভার কাছে করা চলিবে না ভাবিয়া ভূপেন আরও বিষণ্ণ হইয়া যায। এ যেন আরও একটা প্রমাণ যে আট-নবছর যেভাবে তারা কাটাইয়াছে তার পরিবর্তন তাদেব সহিবে না। লাভ হইবে না কিছুই, নষ্ট হইয়া যাইবে তাদের অমূল্য বন্ধুত্ব।

প্রভাও মুখ নিচু করিয়া ভাবিতেছিল, মৃদুস্বরে সে বলিল, এই একটা অসুবিধা আছে।

ভূপেন বলিল, তুমি কি এই জন্য সেদিন বলেছিলে, তোমার ভয় কবছে ?

ঠিক এই জন্য নয়। কী হবে ঠিক বুঝতে পারছি না। আমরা যদি মানিয়ে চলতে না পারি ?

আগে ভূপেন হয়তো সঙ্গে সঙ্গে এ কথার প্রতিবাদ করিত, হাসিয়া উড়াইয়া দিত কথাটা। তারা মানাইয়া চলিতে পারিবে না, সে আর প্রভা ! এখন সে জোর করিয়া কিছু বলিতে পারিল না, দ্বিধাভরে শুধু বলিল, ঝগড়া আমাদের কখনও হবে না প্রভা।

প্রভা একটু হাসিল, ঝগড়া ? ঝগড়ার কথা কে ভাবছে ? ঝগড়া হবে বইকী—হওয়াই ভালো। আমি ভাবছি অন্যকথা। মনে মনে হয়তো দুজনেই বিরক্ত হব, হয়তো মনে হবে বেশ ছিলাম আমরা—

দুজনে স্তব্ধ হইয়া বসিয়া থাকে। দুজনের মনেই যে আশঙ্কা পাক খাইয়া বেড়াইতেছিল, ভাষার মধ্যে স্পষ্ট হইয়া এতদিনে প্রকাশ পাইয়াছে। অস্বীকার কবিবার ক্ষমতা নাই, তুচ্ছ করিবার উপায় নাই।

অনেকক্ষণ পরে ভূপেন বলিল, ও সব ভয় সবারই হয় প্রভা। হয়তো সব ঠিক হয়ে যাবে।

প্রভা বলিল, আগে হলে সব ঠিক হয়ে যেত। আমরা যে বুড়ো হয়ে গেছি।

এ কথাও অস্বীকার করিবার উপায় নাই। দুজনে তারা সত্যই বুড়ো হইয়া পড়িয়াছে। নতুন অ্যাডভেঞ্চার শুরু করিবার বয়স তাদের আর নাই। তীব্র জ্বালা বোধের সঙ্গে ভূপেনের মনে হয়, তাদের এত ভয়-ভাবনার কারণও হয়তো তাই। জীবনের সবচেয়ে বড়ো সার্থকতা হাতের মুঠায় আসিয়া পড়িলেও গ্রহণ করিতে তারা যে ইতস্তত করিতেছে, হিসাব করিতে বসিয়াছে ভবিষ্যতে কতখানি লোকসান দাঁড়াইবে, সে শুধু বয়স তাদের বেশি বলিয়া।

ও সব ভাবনা চুলোয় যাক প্রভা। যা ঘটবার ঘটবে, এখন থেকে ভেবে কোনো লাভ নেই।

তুমি তো বলছ লাভ নেই। আমি যে না ভেবে পারি না !

কথাটা ভূপেনকে আঘাত করে। এতক্ষণে তার যেন খেয়াল হয়, ভয়-ভাবনা শুধু তার একার নয়, প্রভার মনেও তারই মতো দ্বিধা জাগিয়াছে। নিজের পক্ষে তার কাছে যা ছিল একান্ত ন্যায়সঙ্গত চিন্তা, প্রভার মনে তার অস্তিত্ব তার অন্যায় মনে হয়। আনন্দে অধীর হইয়া দিন গোনার বদলে প্রভা তবে হিসাব করিতেছে সুবিধার ও অসুবিধার ? তার কথা আলাদা। তার সরমা ও নন্তু ছিল, বহুদিন সে বাধ্য হইয়া একটা বিশেষ জীবন যাপন করিয়াছে, প্রভার সঙ্গে আবার সেই পুরানো ধাঁচের জীবন নতুন করিয়া আরম্ভ করিবার আগে নানাকথা মনে আসার তার যুক্তি আছে। প্রভার কেন ভয় হইবে, ভাবনা জাগিবে ? এতকাল একা একা নিজের ব্যর্থ অসম্পূর্ণ জীবন টানিয়া চলিয়া তার যখন সার্থকতার, পরিপূর্ণতার সময় আসিয়াছে ?

তোমার ভাবনার কী আছে বুঝতে পারি না প্রভা।

বুঝতে পারবে না। তুমি শুধু নিজের কথা ভাবছ।

হঠাৎ রাগ হল কেন ?

রাগ নয়। সেদিন রাগ হয়েছিল, কোথাও কিছু নেই হঠাৎ সেদিন এসে বলেছিলে, এক মাসের মধ্যে বিয়েটা সেরে ফেলি এসো। ও বিষয়ে যেন আমার কিছু বলারও নেই, করারও নেই। আমার মত আছে কিনা জিজ্ঞেস করারও দরকার মনে করোনি।

আমি ধরে নিয়েছিলাম তোমার মত আছে প্রভা।

তা জানি। তাই তো রাগটা কমে গেল। কিন্তু ও রকম ধরে নেবে কেন ? তুমি নিজের দিক থেকে সব কথা ভাব, আমার কথা ভাব না।

কব্জিতে বাঁধা ছোটো ঘড়িটার দিকে চাহিয়া প্রভা চমকাইয়া উঠিল।

ইস্, কথায় কথায় দেরি হয়ে গেল।

ভূপেন বলিল, যেয়ো না প্রভা। আরও কথা আছে।

পরে কথা হবে। এখন সময় নেই।

সময় নাই। একটি নারী বিপজ্জনক অবস্থায় ব্যথায় কাতর হইয়া পথ চাহিয়া আছে, তার সঙ্গে কথা বলিয়া সময় নষ্ট না করাই প্রভার কর্তব্য। ভূপেন তা স্বীকার করে। বাড়ি ফিরিবার পথে সে তাই ভাবিতে থাকে, দুহাতে সে যখন প্রভাকে বুকে বাঁধিয়া রাখিবে তখনও প্রভা কি উৎকর্ণ হইয়া থাকিবে কখন টেলিফোনের ঘণ্টা বাজে ? অন্য এক নারীর সন্তান প্রসবে সাহায্য করিবার আহ্বান আসিলে মিলন স্থগিত রাখিয়া সে কি বলিবে, পরে আদর কোরো, এখন সময় নেই ?

পাঁচ

শীত শেষ হইয়া আসিয়াছিল, কদিন হঠাৎ গরম পড়িয়াছে। হঠাৎ বলিয়া গরমটা অসহ্য মনে হইতেছে। শরীর কেমন জ্বালা করিতে আরম্ভ করিয়াছে। ভাঙা ভাঙা স্বপ্নময় ঘুমে বিশ্রাম না পাওয়ায় ভোঁতা আলস্য শরীরকে আশ্রয় করিয়াছে।

স্বর্ণের গায়ের রং আরও উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। অধিকাংশ সময়েই শেমিজ সে গায়ে রাখিতে পারে না। গরমে এমন হাঁসফাঁস করে যে শাড়িখানি খুলিয়া রাখিতে পারিলেও যেন বাঁচে। মোটা হওয়ার আগে সে যে কী ভয়ংকর রূপসি ছিল ভাবিলেও মাথা ঘুরিয়া যায়। ভূপেন অবশ্য সে সময় তাকে দেখিয়াছিল, কিন্তু আজ কোনোমতেই একযুগ আগের স্বর্ণকে সে স্মরণ করিতে পারে না। তার মনে হয় স্বর্ণ যেন চিরদিন এমনই ছিল, অবিন্যস্ত একস্তূপ রূপলাবণ্যের মতো।

একটি মেয়ে একদিন জড়িত-পদে ভূপেনের সামনে আসিয়া দাঁড়াইল, অনেকদিন আগেকার স্বর্ণ বলিয়া যাকে ভাবিলেও ভাবা যাইতে পারে। চোখ দুটি কেবল তার খুব বড়ো বড়ো সরমার যেমন ছিল।

মেয়েটিকে দেখিবার জন্যই সে যে এ বাড়িতে আসিয়াছে, ভূপেনের তা জানা ছিল না। একটা বাজে অজুহাত দিয়া অজিত তাকে এখানে ধরিয়া আনিয়াছে। বাড়ির লোকের কথাবার্তা চালচলন আর অতিরিক্ত আদর-যত্নের ভূমিকা প্রথমে তার শুধু একটু খাপছাড়া মনে হইয়াছিল। তারপর ছোটো একটি ছেলের সঙ্গে চিরপ্রচলিত প্রথায়, কোনোরকম সাজগোজ না করার সাজ করিয়া, মেয়েটি যখন নতমুখে ধীরে ধীরে পা ফেলিয়া ঘরে আসিয়া কাঠের পুতুলের মতো দাঁড়াইয়া পড়িল, তখন সে বুঝিতে পারিল কী ঘটিতেছে। সমস্ত ব্যাপারটা এমন হাস্যকর মনে হইতে লাগিল তার ! অজিতও জানে না, এ বাড়ির উৎসুক মেয়ে-পুরুষেরাও জানে না, কত বছর ধরিয়া কনে তার ঠিক হইয়া আছে, কে তার ভবিষ্যৎ বধূ। জানিলে এই কিশোরীকে যাচাই করিবার জন্য সামনে ধরিয়া দিত না।

অজিতকে বলিলে কী চমকটাই তার লাগিবে !

কৌতুকের অনুভূতি কিন্তু তার অল্পক্ষণেই মিলাইয়া যায়। মেয়ে দেখা আর মেয়ে দেখানোর পুরানো রীতিগুলি চোখের সামনে ঘটিতে ঘটিতে তাব মনে পড়াইয়া দেয় বহুকাল আগে সরমাকে দেখিতে যাওয়ার কথা। মনে পড়ে, সেদিনও অজিত তার সঙ্গে ছিল। ঘরের আসবাব ও বসিবার ব্যবস্থাও প্রায় ছিল এই রকম, এমনিভাবে ঘরে ঢুকিয়া পুতুলের মতো দাঁড়াইয়া থাকিয়া বসিতে বলার পর এমনি সন্তর্পণে সরমাও সেদিন জড়োসড়ো হইয়া বসিয়াছিল। মুখ তুলিতে বলিলে এমনিভাবে ধীরে ধীরে সরমা মুখ তুলিয়াছিল, নাম জিজ্ঞাসা করিলে জবাব দিতে গিয়া সরমার গলাও জড়াইয়া গিয়াছিল। বিন্দু বিন্দু ঘাম কী ফুটিয়াছিল সরমার মুখে ? ভূপেনের মনে নাই। মেয়েটি ঘামিয়া উঠিয়াছে।

বিবাহের পর কতদিন সবমা নিজেকে দেখানোর এই অভিজ্ঞতাব কথা বলিয়াছে। কীভাবে বুক ঢিপঢিপ করে, মাথা ঝিমঝিম করে, দম আটকাইয়া আসে কিন্তু জোবে জোবে নিশ্বাস ফেলিতে ভয় হয়।

তোমায় ? মাগো, তখন আবার তোমায় দেখব ! আমি তখন শুধু ভাবছি, কতক্ষণে শেষ হয়, কতক্ষণে শেষ হয়।

শান্তির জন্য ভূপেন মমতা বোধ করে।

এবার ছেড়ে দাও, অজিত।

গাড়িতে উঠিয়া অজিত জিজ্ঞাসা করিল, পছন্দ হল না ? একে যদি তোমার পছন্দ না হয়--

পছন্দ হয়েছে বইকী।

হতেই হবে ! এ শর্মার আবিষ্কার তো।

এমন সুন্দরী মেয়ে খুব কম দেখা যায়।

ও বাবা, এর মধ্যে মজে গেছ ?

মজবার কথা নয় ? টুকটুকে আঙুল দিয়ে কখন পাকা চুল তুলে দেবে ভেবে ধৈর্য ধরছে না ভাই।

ও, তামাশা হচ্ছে ! তারপর ?

তারপর আর কী। ওরা জিজ্ঞেস করলে বলে দিয়ো, মেয়ে পছন্দ হয়েছে, কিন্তু পাত্র নেই। আমার ভাইপোটির বয়েস মোটে ন-বছর।

অজিত ক্রুদ্ধ হইয়া বলিল, আধবুড়ি লেডি ডাক্তার ছাড়া তোমার পছন্দ হবে না জানলে ওদের কথা দিতাম না।

তাই উচিত ছিল।

তোমার মরণ ঘনিয়ে এসেছে বুঝতে পারছি। একটা কথা বলি শুনে রাখো। আমি এখনও মাঝে মাঝে এখানে ওখানে ফুর্তি করে রাত কাটাই তবু বাড়িতে আমার সুখশান্তি আছে, তোমার

যা কস্মিনকালেও থাকবে না। তার কারণটা কি জানো ? পারিবারিক জীবনে কতগুলি নিয়ম মেনে চলি, সুখী হতে হলে সব শালাকে যে নিয়ম মানতে হয়। আরে রাখো তোমার তর্ক, ও সব জানা আছে আমার। কোথায় কী খাটে সে জ্ঞান তোমার আদৌ নেই। একটা কথার জবাব দাও তো আমার, খাওয়ার অনিয়ম করলে কদিন তোমার পেট ঠিক থাকে ? বাড়ির জীবনটা ডাল-ভাত খাওয়ার শামিল, রোজ পোলাও মাংস চলে না। সংসাবী হওয়াব জন্য বিয়ে করবে, ঘরে আনবে একটা ত্রিশ বছরেব লেডি ডাক্তার ! তার কোনো মানে হয় ? অন্য উদ্দেশ্যে বিয়ে করলে কোনো কথা ছিল না। প্রথম সংসার শুরু করলেও নয বুঝতে পাবতাম যাকে নিয়ে যেমন সংসার হোক খাপ খেয়ে যাবে। আনতে চাইছ নন্তুব মার জায়গায আর একজনকে, যাকে আনছ তিনি একদম অন্যরকম। ব্যাপারটা কী দাঁড়াবে ভেবে দেখেছ ?

ভূপেন কথা না বলায় অজিত একটু নরম গলায় বলিল, প্রভার নিন্দে করছি না ভাই। ত্রিশ বছর বয়স হযেছে, ডাক্তারি করে, সেটা দোষেব কথা নয়, আমার পিসির বয়স সাতচল্লিশ, তিনিও লেডি ডাক্তার। তবে যে যা, সে তা। তার তো কোনো উপায় নেই। তোমাদের বনবে না, এই হল আসল কথা।

বাড়ি ফিরিতেই স্বর্ণ সাগ্রহে জিজ্ঞাসা কবে, কেমন দেখলে ঠাকুরপো মেয়েটাকে ? ওকে দেখলে আমার কান্না আসে ঠাকুরপো।

কান্না আসে ?

আমার তো জানাশোনা, আমি জানি। ওর চালচলন কথাবার্তা সব যেন তার মতো, স্বভাবটি পর্যন্ত। কোথায় পেল কে জানে !

দেখিতে সরমার মতো নয়, সে বকম হওয়া এ জগতে কোনো মেয়ের পক্ষেই সম্ভব নয়, তবে চালচলন, কথাবার্তা স্বভাব সব সরমার মতো। ভূপেন আশ্চর্য হইয়া যায়।

প্রভাকে বিবাহ করার কথা ভাবা যায় কিন্তু সরমার বিনিময়ে তাকে বাড়িতে আনিবার কথা সত্যই কল্পনা করা যায় না। এই মেয়েটিকে কিন্তু সেভাবে ভাবা চলে। বাড়ির সকলের সঙ্গে এক হইয়া যাইবে, খালি পায়ে নিঃশব্দে ঘরের কাজ করিযা বেড়াইবে, খাটে গদির বিছানা থাকিতে দুপুববেলা মেঝেতে আঁচল বিছাইয়া ঘুমাইবে, নিজেকে একেবারে লোপ করিয়া ধরা দিবে ঠিক সরমার মতো। প্রভা নয়, ঠিক এই মেয়েটির পক্ষেই যেন তা সম্ভব।

ঠাকুরপো, সে গিয়ে অবধি সবাব বুক খালি, ঘর খালি। তার অভাব তো আব কাউকে দিয়ে পূর্ণ হবার নয়, তবু শান্তিকে তুমি ঘরে আনো, আমাদের প্রাণ একটু হালকা হোক।

বউদি ঘনঘন চোখ মুছিতে থাকে।

সন্ধ্যাব পব ভূপেন প্রভাকে একবার ফোন করিল। প্রভার সঙ্গে কিছুক্ষণ কাটাইয়া আসিবার জন্য মনটা তার উতলা হইয়া উঠিয়াছিল। প্রসন্ন খবর দিল প্রভা বাড়ি নাই, সকালে দশটার সময় বাহির হইয়া গিয়াছে, এখনও ফেরে নাই। বিকালে বাড়িতে প্রভা একবার ফোন করিয়া জানাইয়া দিয়াছে, কখন সে বাড়ি ফিরিতে পারিবে কিছুই ঠিক নাই। একটা জরুরি কেসে সে আটকা পড়িয়া গিয়াছে।

প্রসন্নর কাছে নম্বর জানিয়া ভূপেন রোগীর বাড়িতে প্রভাকে ফোন করিল।

প্রভা বলিল, কী করে ফিরব ? রোগীর আমার এখন তখন অবস্থা। কী কষ্ট যে পাচ্ছে বউটা, দেখলে তোমাদের পুরুষমানুষদের অভিশাপ দিতে ইচ্ছা হয়।

খট্ করিয়া প্রভার সাড়াশব্দ বন্ধ হইয়া গেল।

ঘরে বসিয়া ভূপেন ভাবিতে থাকে এবার কী করা যায়। কাজ করিতে, বই পড়িতে ভালো লাগে না, বন্ধুদের সঙ্গে গিয়া গল্পগুজবে সময় কাটানোর চিন্তাটাও সে বাতিল করিয়া দেয়। সিনেমায় যাইতে সে ভালোবাসে না।

কিছু ভালো লাগে না। বড়ো একা মনে হয় নিজেকে। সময় বুঝিয়াই যেন অভাববোধের পীড়নটা আরও জোরালো হইয়া উঠিয়াছে। কাজের মধ্যে অন্যমনস্ক হওয়ার চেষ্টা কবিবে ভাবিয়া কাজের ঘরে যাওয়ার জন্য জোর করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া আবার সে মত পরিবর্তন করে। জানালায় দাঁড়াইয়া শহরের আলোকমালার দিকে চাহিতে চাহিতে অল্প দূবে অন্য বাড়ির একটি আলোকিত ঘবের ভিতরে তার চোখ আটকাইয়া যায়। ক্যাম্প চেয়ারে কাত হইয়া একটি লোক চুপ কবিযা পড়িয়া আছে, মেঝেতে পা রাখিয়া খাটের উপর উপুড় হইয়া পড়িয়া আছে একটি মেয়ে। তার প্রসাবিত হাতের কনুই পর্যন্ত দেখা যায়, পুতুলের বালিশের মতো ছোটো একটি বালিশে কনুই রাখিয়া কী যেন করিতেছে মেযেটি। ছেলেকে ঘুম পাড়াইতেছে নিশ্চয়। ছোটো বালিশের ও পাশে নিশ্চয় একটি শিশু শুইয়া আছে, পড়িয়া যাওয়ার ভয়ে তাকে ঠেলিয়া দেওয়া হইয়াছে দেয়ালের দিকে খাটের শেষ প্রান্তে।

কেউ নড়ে না। না পুবুষটি, না তার বউ। আট-দশমিনিট পরে বউটি সোজা হইয়া দাঁড়ায়, ঘরের মধ্যে এদিক ওদিক একটু নড়াচড়া করিয়া বাহিরে চলিয়া যায়—দুজনের মধ্যে একটি কথাও হয় না। পুবুষটি তেমনিভাবে পড়িয়া থাকে, একটা সিগারেট ধরাইয়া অর্ধেক টানিয়া নিভাইয়া রাখে। কিছুক্ষণ পরে বউটি আসিয়া এক কাপ চা লোকটির হাতে দিয়া আবার চলিয়া যায়, দাঁড়ায না, গল্প করে না, ফিরিয়া তাকায় না। তারপর বহুক্ষণ সময় কাটিযা যায়, বউটি আসে না। চা শেষ করিয়া পেয়ালা নামাইয়া রাখিয়া লোকটি আবার সেই আধখানা সিগারেট খায়, মাঝে মাঝে উঠিযা খাটে উপুড় হইয়া বোধ হয় ছেলেকেই একটু থাপড়াইয়া আবাব ক্যাম্প চেয়ারে চুপ কবিয়া বসিয়া থাকে। এমন চুপচাপ বিনা কাজে মানুষ একা কী করিয়া বসিয়া থাকিতে পাবে ভাবিয়া ভূপেন অবাক হইযা যায়। দাঁড়াইয়া থাকিতে থাকিতে তাব পায়ে ব্যথা ধরিয়া যায় তবু সে জানালা ছাড়িযা নড়িতে পাবে না। খারাপ লাগে না লোকটাব ? একা মনে হয় না নিজেকে ? একটা বইয়ের পাতা উলটানোব প্রয়োজন পর্যন্ত অনুভব করে না ?

বহুক্ষণ পরে একটা ছোটো বাটি হাতে বউটি ঘরে আসে। ছেলেকে খাওয়ানোব জন্য দুধ আনিয়াছে বুঝিতে কষ্ট হয় না। কী যেন সে বলে লোকটিকে, সে কথা বলে না কিন্তু মুখে তাব হাসি দেখা দেয়।

প্রতিদিন হয়তো এমনিভাবে লোকটি সন্ধ্যা যাপন করে, চুপচাপ একা বসিযা ছেলেকে পাহাবা দিয়া। বন্ধু, কাজ, বই কিছুই তার দরকার হয় না। কেন দবকার হয না এতক্ষণে ভূপেন তা বুঝিতে পারিয়াছে। একাকিত্বের অনুভূতি লোকটির জাগে না। ছেলে তাব সামনে খাটে শুইযা ঘুমাইতেছে, কখন ঘুম ভাঙিয়া কাঁদিয়া উঠে ঠিক নাই। বউ তার ঘরের কাজ করিতেছে, কখন ঘরে আসে ঠিক নাই। নাও যদি ঘরে আসে, যখন খুশি নাম ধরিয়া ডাকিলেই আসিবে। না ডাকিলেও কাজ শেষ করিয়া বাহিরের সব প্রয়োজন মিটাইয়া সমস্ত রাত্রির জন্য সে তো আসিবেই—যত সময় যায় ততই তার সেই আসিবার সময় কাছে আসে। সারাদিন হয়তো সে আপিসে খাটিয়াছে, ক্যাম্প চেয়ারে গা এলাইয়া মনকে শিথিল করিয়া চুপচাপ পড়িয়া থাকাই লোকটির কাছে পরম উপভোগ্য বিশ্রাম। সময় কাটানোর কোনো উপলক্ষই হয়তো সে চায় না। একাই সে থাকিতে চায়।

তাই বটে। সন্ধ্যা হইতে রাত্রি এগারোটা পর্যন্ত সরমা যদি ঘরে না আসিত, এ রকম একা কী মনে হইত তার নিজেকে ? সরমা বাড়িতে আছে, কাজ অথবা গল্পে ব্যস্ত হইয়া আছে, নন্তুকে লইয়া জ্বালাতন হইতেছে, শুধু এইটুকু জানা থাকিলেই কি এই একাকিত্বের ভার অনেক হালকা হইয়া যাইত না ? ওই লোকটির মতো চুপচাপ হয়তো বসিয়া থাকিতে তার ভালো লাগিত না, নন্তুকে পাহারা দিয়াও নয়, কিন্তু এমন ভোঁতা যন্ত্রণাদায়ক বিষাদ তার জাগিত না নিশ্চয়।

ঘরের দেয়ালে সরমার প্রকাণ্ড একটি ফটো টাঙানো আছে। তার পাশে নন্তুর ছোটো একটি ফটো। শোয়ার ঘরে ভূপেন খুব কম আসে। সরমার ফটোর দিকে সে তাকায় না, ইচ্ছা করিয়াই

তাকায় না। আজ জানালা হইতে সরিয়া আসিয়া একাগ্র দৃষ্টিতে বহুক্ষণ সে সরমার ফটোর দিকে চাহিয়া রহিল। না, সরমাকে সত্যই সে ভালোবাসে নাই, প্রভাকে যেমন ভালোবাসে। কিন্তু সরমা তার জীবনের অনেকখানি জুড়িয়া ছিল। তার দৈনন্দিন ধরাবাঁধা জীবনে অতখানি অধিকার বিস্তারের ক্ষমতা প্রভারও কোনোদিন হইবে না।

অনিবার্য অবিরাম মোহের মতো প্রভা তার মনকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে, প্রভা আজ মরিয়া গেলে তার জীবনীশক্তি ঝিমাইয়া পড়িবে, চেতনা স্তিমিত হইয়া আসিবে। সরমা মরিয়া যাওয়ায় তার কষ্ট হইতেছে, অসহ্য কষ্ট হইতেছে। দিনান্তে একত্র বসিয়া প্রভার সঙ্গে দু-দণ্ড কথা বলিতে না পারিলে সে বাঁচিয়া থাকিতে পারে, সরমাকে সর্বদা কাছে না পাওয়ায় জীবনটাই তার দুর্বহ হইয়া উঠিয়াছে।

প্রভা সরমা হইতে পারিবে না। ওই অজানা অচেনা শান্তি মেয়েটি হয়তো সরমাকে নকল করিতে পারে, প্রভা পারিবে না।

কাজের ঘরে যাওয়ার জন্য বারান্দায় আসিতেই সংসারের বিচিত্র কলরব ভূপেনের কানে আসে। পিসি কাকে বকিতেছে। বমলা শিখিতেছে গান। পাশের ঘরে বিমলা আর স্বর্ণ কথা বলিতেছে। নীচের ঘরে ছোটো ছেলেমেয়েরা গোলমাল করিতেছে। মা ঠকঠক করিয়া হামানদিস্তায় গুঁড়া করিতেছেন পানের মশলা। রান্নাঘর হইতে শব্দের বদলে ভাসিয়া আসিতেছে সম্ভারের তীব্র সুবাস। উপেনের সিগারের কড়া গন্ধও সেই ঝাঁঝালো সুবাসের নীচে প্রায় চাপা পড়িয়া গিয়াছে।

নিয়ম আছে। সুখের সংসার পাতিবার কতগুলি নিয়ম আছে, চোখ-কান বুজিয়া সেগুলি মানিয়া চলিতে হয়। অজিত এই কথা বলিয়াছিল। বলিয়াছিল, নিয়মগুলি সে সাধনার মতো মানিয়া চলে বলিয়া সে সুখী। সাংসারিক সুখ-শান্তির আতিশয্যে অজিতের যে সত্যই ছোটোখাটো একটি ভুঁড়ি গড়িয়া উঠিতেছে তাও চোখ মেলিয়া চাহিলেই দেখা যায়। তার কথাই কি ঠিক ? সুখী হওয়া কি এত কঠিন আর সহজ ? আট-নবছর ধরিয়া ভালোবাসার ব্রত পালন করিবার পরেও যাকে ভালোবাসা যায় তাকে লইয়া সংসার পাতিয়া সুখী হওয়া যায় না, অজানা অচেনা শান্তিকে লইয়া অনায়াসে পাতা যায় সুখের সংসার ?

হয়তো তাই। সংসারে ভালোবাসার স্থান নাই। সুখশান্তির সঙ্গে সম্পর্ক নাই ভালোবাসার।

হঠাৎ-পড়া গরমের পর দুদিনের জন্য বসন্তের নাতিশীতোষ্ণ বাতাস বহিতে শুরু করিল। যার বসন্ত শুধু তাকে তোলা কাব্যের পাতায় থাকে, তাকেও স্বীকার করিতে হইল বসন্তের বাতাসে দেহমনের কমবেশি কিছু পরিবর্তন ঘটিয়াছে। মন উড়ুউড়ু না করুক, অন্তত ক্ষুধা আর উৎসাহ যে একটু বাড়িয়াছে বেশ বুঝা যায়।

বিকালে প্রভা নিজেই ভূপেনকে তার বাড়ি যাইতে বলিয়াছিল। বিকালে ভূপেন গিয়া শুনিল, দুপুরে সে কোথায় বাহির হইয়াছে, সন্ধ্যার আগেই ফিরিবে।

প্রসন্ন বলিল, তোমায় বসতে বলে গেছে।

ভূপেন বলিল, আসতে না বললেই হত।

প্রসন্নও মুখভার করিয়া বলিল, ওর ওই রকম স্বভাব।

প্রসন্ন নিন্দা করায় ভূপেন তখন প্রভাকে সমর্থন করিয়া বলিল, ডাক এলে না গিয়ে তো উপায় নেই। রোগীর কথা আগে ভাবতে হবে বইকী।

প্রসন্ন একটা নিশ্বাস ফেলিল। সে বড়ো আশ্চর্য নিশ্বাস, এত বেশি ক্ষোভে ভরা যে শুনিলেই বুঝিতে পারা যায় নিশ্বাসটা ক্ষোভের, হতাশার নয়।

ওকে ডাক্তারি পড়িয়েই ভুল করেছি ভাই। ভাই বিগড়ে যায় সেটা তেমন লাগে না, সে ব্যাটাছেলে। বোন যা খুশি তাই শুরু করলে সয় না। কিছু বলারও উপায় নেই। নিজে রোজগার করে, কারও অধীন তো নয়।

ভূপেন স্তম্ভিত হইয়া বসিয়া থাকে। তার কাছে প্রসন্ন প্রভার সম্বন্ধে এমন কথা বলিতে পারে, কানে শুনিয়াও তার বিশ্বাস হইতে চায় না।

প্রসন্ন ধীরে ধীরে কামানো চিবুকে হাত বুলায়, বিষণ্ন চিন্তিত মুখে অনেকটা স্বগতোক্তির মতো বলে, ভাবি আর আপশোশ হয়, সময়মতো বিয়ে দিয়ে ওকে যদি সংসার পেতে সুখী হবার সুযোগ দিতাম ! এ সব বিকার জন্মে জীবনটা ওর মাটি হয়ে যেত না। ধীরেন মিত্রের সঙ্গে কী সব কাণ্ড আরম্ভ করেছে আবার। একটা মাতাল গুন্ডা লোক, আত্মীয়স্বজন যাকে বাড়ি ঢুকতে দেয় না, তার সঙ্গে মাখামাখি শুরু করলে দশজনে বলবে না দশকথা ! তোমায় বলব কী ভাই, মানুষকে মুখ দেখাতে আমার লজ্জা করে।

কী বলছেন প্রসন্নদা ? কিছুই বুঝতে পারছি না তো ?

থাকগে, বলে কাজ নেই। এতকাল চুপ করে আছি, চুপ করে থাকাই ভালো।

প্রসন্নের উদ্দেশ্য ভূপেন বুঝিতে পারে না। এখন পর্যন্ত প্রকাশ্যভাবে ঘোষণা না করিলেও প্রসন্ন নিশ্চয় অনুমান করিতে পারিয়াছে অল্পদিনের মধ্যেই প্রভাকে সে বিবাহ করিবে। এ সময় প্রভার বিরুদ্ধে এ সব বিশ্রী কথাগুলি তাকে জানানোর মানে কী ?

প্রভার সম্বন্ধে সে কি তাকে সাবধান করিয়া দিতে চায় ? বলিতে চায়, আমার বোনটি অতি খারাপ মেয়ে, তাকে নিয়ে তুমি বিপদে পড়বে, অতএব বুঝেসুঝে কাজ করো ? নিজের বোনের ক্ষতি করিয়া তার ভালো করার জন্য প্রসন্নের এতখানি আগ্রহ অতি খাপছাড়া মনে হয় ভূপেনের। সে অবশ্য বিশ্বাস করে না এ সব কথা, প্রভার সঙ্গে তার দুদিনের পরিচয় নয়, তবু এই রকম ধারণাই যদি বোনের সম্বন্ধে প্রসন্নের হইয়া থাকে, চুপ করিয়া থাকাই তো তার উচিত ছিল। সময়মতো বিবাহ দিয়া বোনকে সংসারী ও সুখী করে নাই বলিয়া যদি তার আপশোশ, আজ বোনের সংসারী ও সুখী হওয়ার সম্ভাবনা যখন দেখা দিয়াছে, সে সম্ভাবনাকে প্রসন্ন নষ্ট করিয়া দিতে চায় কেন ?

তাছাড়া প্রসন্ন কি ভুলিয়া গিয়াছে আজ কতকাল প্রভার সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠতা, প্রভার সম্বন্ধে কিছুই তার অজানা নাই ?

মুখ গম্ভীর করিয়া ভূপেন বলিল, প্রভার যা প্রফেশন, তাতে ভালোমন্দ সববকম লোকের সঙ্গেই ওকে মিশতে হয় প্রসন্নদা। কে কেমন মানুষ, অত হিসাব কবে ডাক্তারি চলে না।

তা কি আমি জানি না ভাই ? সে রকম হলে তো কথাই ছিল না। পবশু ধীরেন মিত্রের বাগানবাড়িতে রাত একটা পর্যন্ত কাটিয়ে এল।

কী বলছেন পাগলের মতো ?

পাগলের মতোই বলছি ভাই। পাগল না হলে বোনের নামে এমন কথা কেউ বলতে পারে ? তুমি পর নও ভূপেন, তুমিও ওর দাদার মতো। আমায় ও মানে না, কিন্তু তোমায় শ্রদ্ধা করে, তোমার কথা শোনে। তুমি চেষ্টা করে হয়তো ওকে শুধরে নিতে পার।

প্রভা তো ছেলেমানুষ নয় প্রসন্নদা। ওর প্রায় ত্রিশ বছর বয়স হতে চলল।

অ্যাঁ? তা বটে। সে কথা মিথ্যে বলনি। কী জান ভূপেন, কথাটা আমি ভুলেই যাই। এখনও মনে হয় ও যেন ছেলেমানুষ রয়ে গেছে। যাই হোক, তুমি যেন ওকে বোলো না, আমি তোমায় কিছু বলেছি। রাগ হলে ওর আবার কাণ্ডজ্ঞান থাকে না।

প্রসন্ন উঠিয়া যায়। ভূপেন চুপ করিয়া বসিয়া থাকে। প্রভা তাকে শ্রদ্ধা করে, তার কথা শোনে। সে পর নয়, প্রভার সে দাদার মতো। সে চেষ্টা করিলে এখনও প্রভাকে শুধরাইতে পারে। এ সব

ভাবিয়াই কি প্রসন্ন প্রভার সম্বন্ধে বিশ্রী কথাগুলি তাকে জানাইয়াছে ? সে কি তবে জানে না তার আর প্রভার মধ্যে কী বুঝাপড়া হইয়া গিয়াছে ?

আধঘণ্টা পরে প্রভা আসিল, তথাকথিত ধীরেন মিত্রের গাড়িতে স্বয়ং ধীরেন মিত্রের সঙ্গে। কিছুক্ষণের মধ্যে একেবারে প্রত্যক্ষ প্রমাণ হাজির হইবে জানিয়াই যেন প্রসন্ন ঠিক সময় বুঝিয়া প্রভার নামে তার অভিযোগগুলি ভূপেনকে জানাইয়া দিয়াছিল। প্রসন্ন কী জানে না পুরুষের মন কী রকম সন্দেহপ্রবণ ! তার কাছে অত কথা শোনার পর একেবারে চোখের সামনে ধীরেন মিত্রের দামি মোটর গাড়ি হইতে নামিয়া আসিতে দেখিলে ভূপেনের মনটা যদি বিগড়াইয়া যায়, প্রসন্নর বিপদটাও হয়তো ফসকাইয়া যাইতে পারে।

ধীরেন বলিল, কেমন আছেন ভূপেনবাবু ?

ভালো আছি।

ভূপেনকে প্রভা কিছুই বলিল না। ব্যস্তভাবে ভিতরে যাইতে যাইতে ধীরেনকে শুধু বলিয়া গেল, একটু বসুন ধীরেনবাবু, আসছি।

দুজনে চুপ করিয়া বসিয়া থাকে, গায়ে পড়িয়া আলাপ জমানোর চেষ্টা ধীরেন আর করে না। ভূপেন সত্যই বড়ো আশ্চর্য হইয়া গিয়াছিল। মনের মধ্যে ক্ষীণ একটা প্রতিবাদ জোরালো হইয়া উঠিয়া ক্রমে ক্রমে প্রভার ব্যবহারের ক্রুদ্ধ অসমর্থনে পরিণত হইয়া যাইতেছিল। সত্যই এটা তো উচিত নয় প্রভার। প্রভাকে সে সন্দেহ করে না বটে কিন্তু ধীরেনের মতো মানুষের সঙ্গে মেলামেশা করাই তো তার উচিত নয়। এবং কারও বলিয়া দিবার অপেক্ষায় না থাকিয়া নিজেরই তার এটা বুঝা কর্তব্য ছিল। আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধব যাকে এড়াইয়া চলে তার সঙ্গে মোটরে চাপিয়া ঘুরিয়া বেড়াইলে যে মানুষ সত্যসত্যই নিন্দা করিবে এটুকু বুঝিবার মতো বুদ্ধি প্রভার নিশ্চয় আছে।

প্রভা নামিয়া আসিয়া এক টুকরা কাগজ ধীরেনের হাতে দিল, তারপর মৃদুস্বরে কথা বলিতে বলিতে ধীরেনের সঙ্গে আগাইয়া গেল বাহিরের বারান্দা পর্যন্ত।

ভূপেন জানে এ সব কিছু নয়। কিন্তু জানিয়াও মনটা তার কেমন ব্যাকুল হইয়া উঠে। ধীরেনকে প্রভার এমন নির্বিকারভাবে গ্রহণ করা, ধীরেনের সঙ্গে তার এমন সহজ সম্পর্ক বজায় রাখা তার কাছে প্রভার স্বতন্ত্র ও নির্দিষ্ট ব্যক্তিত্বের অস্তিত্বকে স্পষ্ট করিয়া তুলিতে থাকে। প্রভার এই ব্যক্তিত্বই ভূপেনের সবচেয়ে বিপজ্জনক মনে হয়। ধীরেনের দুর্নাম আছে কি নাই প্রভা হয়তো তা গ্রাহ্যও করে না। নিজে যদি সে মনে করে ধীরেনের সঙ্গে মেলামেশা চলিতে পারে, ধীরেনের সঙ্গে মেলামেশা সে করিবেই।

ধীরেনের বাগানবাড়িতে রাত্রিযাপনের কথাটা ভূপেন মনের তাকে তুলিয়া রাখিয়াছিল, কথাটা বিশ্বাস করিবে কী অবিশ্বাস করিবে কিছুই ঠিক করে নাই। কথাটা সত্য হইলেও তার মানে কী দাঁড়ায় ভাবিবার চেষ্টা সে করে নাই। ধীরেনের সম্পর্কে ওদিক দিয়া কোনো পীড়াদায়ক চিন্তা মনে আনিবারও যে প্রয়োজন নাই, এ ধারণা ভূপেনের নাড়া খায় নাই। তার বউ হওয়ার আয়োজন করিতে করিতে প্রভা আর একজনের বাগানবাড়িতে শখ করিয়া রাত কাটাইতে যাইবে, এ চিন্তা মনে আনাও ভূপেনের হাস্যকর মনে হয়।

তবে প্রভাকে একবার জিজ্ঞাসা করা দরকার কী হইয়াছিল। শুধু কৌতূহল মেটানোর জন্য জিজ্ঞাসা করা, আর কিছু নয়।

পরশু রাত্রে কোথায় ছিলে প্রভা ?

একজনকে ছেলে বিয়োতে হেল্‌প করছিলাম। আমার আর কাজ কী ! প্রভা হাসিল, বলিল, চলো, ওপরে যাই।

প্রসন্ন তবে মিথ্যা বলিয়াছে। প্রভা রোগীর বাড়িতে ছিল, ধীরেনের বাগানবাড়িতে নয়। হয়তো কিছু না জানিয়াই প্রসন্ন ধরিয়া লইয়াছে যে রাত্রে প্রভা ধীরেনের বাগানবাড়িতে ছিল। নয়তো প্রভাকে জিজ্ঞাসা করিলেই ধরা পড়িয়া যাইবে জানিয়া তার কাছে সে মিথ্যা বলিবে কেন ?

উপরে গিয়া ভূপেনকে ঘরে বসাইয়া প্রভা হঠাৎ বলিল, পরশু রাত্রির কথা জিজ্ঞেস করলে কেন ? ধীরেনবাবুর বাগানবাড়িতে ছিলাম শুনেছ বুঝি ?

ভূপেন নীরবে সায় দিল।

তবে যে জিজ্ঞেস করলে কোথায় ছিলাম ?

বাগানবাড়িতে ছিলে বিশ্বাস হয়নি।

বিশ্বাস হয়নি ? ও !

প্রভা স্থিরদৃষ্টিতে ভূপেনের মুখের দিকে চাহিয়া থাকে, দ্বিধা আর প্রশ্নভরা দৃষ্টিতে। কী যেন বুঝিতে চাহিয়া সে বুঝিতে পারিতেছে না।

ধীরেনবাবুর বাগানবাড়িতেই ছিলাম।

কোনো কারণ ছিল নিশ্চয়।

কী মানুষ তোমরা ! তবু কিছুতে স্বীকার করবে না মনে খটকা বেধেছে ! আমি পাছে কিছু মনে করি তাই সন্দেহ করতে ভয় হচ্ছে, না ?

অত হিসেব করে কেউ সন্দেহ করে নাকি প্রভা ? সন্দেহ, অবিশ্বাসের কথা আমি ভাবিনি, ও সব বাদ দাও। তবে কাজটা তুমি সত্যি খুব অন্যায় করেছ।

সব না শুনেই বলছ অন্যায় ?

শুনেও তাই বলব।

বেশ, আগে শুনে নাও। ধীরেনবাবু ওখানে একটি মেয়েকে রেখেছেন। ভগবান জানেন কার মেয়ে, কোথা থেকে জুটিয়েছেন। পরশু সারারাত কষ্ট পেয়ে কাল ভোরে ওই মেয়েটার একটি ছেলে হয়েছে। নটা-দশটার সময় আমি গিয়েছিলাম, তারপর আর ফিরে আসার উপায় ছিল না। আমি ফেলে চলে এলে মেয়েটা মরেও যেতে পারত।—অন্যায় করেছি ?

নিশ্চয়। একজন পুরুষ ডাক্তারকে ডাকিয়ে তুমি অনায়াসে চলে আসতে পারতে।

কেন ? নিজের রোগীকে অন্য ডাক্তারের হাতে ছেড়ে দিয়ে পালিয়ে আসব কেন ?

সংসারে থাকতে হলে কতগুলি নিয়ম মেনে চলতে হয় প্রভা। এমনিই কোনো ভদ্রলোকের বাড়িতে দরকার মতো সারারাত থেকে এলে কেউ কিছু বলার সুযোগ পায় না। কিন্তু ধীরেন মিত্তিরের বাগানবাড়িতে তুমি রাত কাটিয়েছ শুনলে লোকে কী বলবে ভেবে দেখেছ ? ব্যাপারটা এমনিই তো কুৎসিত, তাছাড়া চাপা দেবার চেষ্টাও করা হয়েছে নিশ্চয় ? তুমি ছাড়া আর যদি ডাক্তার না পাওয়া যেত তবে অন্য কথা ছিল। ব্যাপারটা যাতে জানাজানি না হয় সেই জন্যই তো ধীরেন তোমাকে নিয়ে গেছে।

আমার অত সব ভাববার তো দরকার নেই। ডাক্তার হিসেবে আমায় ডেকেছে, ডাক্তার হিসেবে আমি গেছি। কে ডেকেছে, কোথায় ডেকেছে, আমার তা দেখবার দরকার নেই।

গয়না কেড়ে নেবার মতলবে একটা গুন্ডা যদি তোমায় ডাক্তার হিসাবে ডাকে, জেনেশুনেও যাবে তুমি ?

ছেলেমানুষের মতো কথা বোলো না।

প্রভা উঠিয়া যায়। ভূপেন জানে, সে এখনই ফিরিয়া আসিবে, শুধু আলোচনাটা বন্ধ করিবার জন্য সে উঠিয়া গেল। আসিয়া হয়তো বলিবে, তোমার জন্য চা আনতে বলেছি, চা খাবে তো এখন ? বলিয়া এতক্ষণের তর্ককে একেবারে বাতিল করিয়া নূতন বিষয়ে কথা আরম্ভ করিবে।

যতক্ষণ প্রভা সামনে বসিয়া কথা বলিতেছিল প্রতি মুহূর্তে তার মনে কী ভাবের উদয় হইতেছে ভূপেন স্পষ্ট অনুমান করিয়া যাইতেছিল। আগেও এটা সে খেয়াল করিয়াছে। প্রভা কী বলিবে, তাব কথা শুনিয়া প্রভাব মধ্যে কী প্রতিক্রিয়া জাগিবে, আগে হইতেই সে যেন তা জানিতে পারে। সবদিন নয়, মাঝে মাঝে। যেদিন প্রভাব সঙ্গে কোনো বিশেষ কথা আলোচনা কবিবার থাকে অথবা যেদিন প্রভাকে দেখিবাব জন্য মন অত্যন্ত ব্যাকুল হইযা পড়ে, সেইদিন। হযতো এই সব বিশেষ দিনে তাব মন বুদ্ধি ইন্দ্রিয় সমস্ত জগতের সঙ্গে সম্পর্ক প্রত্যাহার কবিয়া শুধু প্রভাকে আশ্রয় করে বলিয়া এটা সম্ভব হয়, প্রভার চোখের পাতা কাঁপিযা গেলে, অধরোষ্ঠেব মিলন রেখার তুচ্ছ একটু ব্যতিক্রম ঘটিলে তাও তার চোখ এড়ায় না, সে মানে বুঝিতে পাবে। এমনিভাবে কিছু না জানিয়াও সে জানিতে পারিয়াছিল প্রভা তাকে ভালোবাসে। এমনভাবে জানিতে পারিযাছিল যে মাঝে মাঝে তার মনে হইত পৃথিবীর সমস্ত মানুষও বুঝি জানিতে পাবিয়াছে তাব ভালোবাসাব কথা, এত স্পষ্ট ছিল প্রভাব নিঃশব্দ ভাষাহীন ঘোষণা !

আজ আগাগোড়া ভূপেনের মনে হইতেছিল, প্রভা তাকে কী যেন একটা আঘাত দিবাব জন্য প্রস্তুত হইয়া আছে। এখন একা বসিয়া এই আশঙ্কাটাই তার প্রবল হইযা উঠিতে থাকে। কোন দিক দিয়া কীভাবে আঘাতটা আসিবে সে বুঝিতে পাবে না, কিন্তু তাকে যে মর্মাহত হইতে হইবে এ বিষয়ে সে নিঃসন্দেহ হইয়া থাকে। অজানা বিপদেব প্রতীক্ষা করাব মন লইযা সে প্রভার ফিবিযা আসার প্রতীক্ষা করিতে থাকে।

পভা ফিরিয়া আসিযা বলে, চা আনতে বললাম আব সন্দেশ। বাড়িতে তৈবি।

ভূপেন বলিল, আমিও তাই ভাবছিলাম। সন্দেশেব কথাটা বাদে।

প্রভা বলিল, তোমার সঙ্গে একটা কথা আছে আমাব।

ভূপেন বলিল, আমি তাও ভাবছিলাম প্রভা।

বাহিরে শান্তভাব বজায় বাখিযা ভূপেন উদ্‌বেলিত হৃদয়ে প্রতীক্ষা করে। ছোটো টিপয়টিতে প্রভা হাত রাখিযাছে, তাব হাতেব আঙুলগুলি আশ্চর্যরকম কোমল ! কে বলিবে হাতটি একজন ডাক্তারের, অতি অনমনীয কঠোব প্রকৃতির ডাক্তাবের, যে স্ত্রীলোক হইয়াও স্ত্রীলোক নয।

প্রভা চুপ কবিয়া আছে দেখিয়া ভূপেন একটু আশ্চর্য হইয়া গেল। আঘাত দিতে সে তো কখনও ইতস্তত করে না।

কী বলছিলে প্রভা ?

বলছিলাম, আমাদের ওটা ছ-মাস এক বছব পিছিযে দেওয়া যাক। তাড়াতাড়ি করার কী আছে !

তাড়াতাড়ি ! আট বছর অপেক্ষা কবার পরেও প্রভার আজ তাড়াতাড়ি মনে হইতেছে ! বাগ করিবে ভাবিয়াও কিন্তু ভূপেন রাগ করিতে পাবে না। একটু অভিমান পর্যন্ত তার জাগে না। প্রভার কথা শুনিয়া তার অনুভূতির জগতে হঠাৎ এক অদ্ভুত পরিবর্তন ঘটিযা যায, কতগুলি অনুভূতি যেন বাঁধা তারের মতো অতিরিক্ত মোচড়ে টনটন করিতেছিল, হঠাৎ ঢিল হইয়া গিয়াছে। কিছুদিন হইতে একটা যে অস্বাভাবিক উত্তেজনা তাকে পীড়ন করিতেছিল, সর্বদা শ্রান্তি আর বিরক্তিবোধ মেজাজ খারাপ করিয়া রাখিয়াছিল, সমস্ত মিলাইয়া গিয়া সে শুধু অনুভব করে অবসন্নতা। বারবার মনে হইতে থাকে, আরও ছ-মাস এক বছর কোনো পবিবর্তন দরকার হইবে না, আরও কিছুকাল প্রভাকে আগের মতো কাছে পাওয়া যাইবে।

সেও কি বিবাহের দিন পিছাইয়া দিতে চাহিয়াছিল ? প্রভা মুখ ফুটিয়া বলিতে পারিয়াছে, সে শুধু ইচ্ছাটা মনের মধ্যে গোপন করিয়া রাখিয়াছিল ?

বেশ, তাই হবে। ভূপেন বলে।

তুমি এত সহজে রাজি হবে ভাবিনি। রাগ করবে না ?

না। তোমার ওপর কখনও রাগ করেছি প্রভা ?

একটা শুধু ভয় আছে আমার। আবার পাগলামি করবে না তো, যেমন আরম্ভ করেছিলে ?

ভূপেন মৃদু হাসিয়া মাথা নাড়িল।—এই জন্যে তুমি রাজি হয়েছিলে, না ? আমাকে বাঁচাবার জন্যে ?

শুদু ওই জন্যে নয়।

ঠাকুর চা সন্দেশ আর জলের গ্লাস রাখিয়া গেল। ভূপেন খেয়াল করিয়া আশ্চর্য হইয়া গেল জীবনের এমন গুরুতর ব্যাপারের যখন নিষ্পত্তি হইতে থাকে তখনও পেটের তাগিদ চাপা পড়ে না, তার রীতিমতো ক্ষুধা পাইয়াছে !

মুখে তুলিবাব জন্য সন্দেশের প্লেটেব দিকে সে হাত বাড়াইতে যাইতেছে, প্রভা উঠিয়া আসিয়া পাশে দাঁড়াইয়া নিজেই তার মুখে সন্দেশ তুলিয়া দিল।

ঠাকুর তখন চলিয়া গিয়াছে।

শুধু ওই জন্যে নয়। কী যে হযেছে আমার, ভালো বুঝতে পাবি না। তোমায় নিয়ে কত রকম স্বপ্ন দেখি, কত কল্পনা করি, কিন্তু সত্যি সত্যি সব ঘটবে ভাবতে গেলেই কেমন ভয় হয়। মনে হয়, যেমন ভাবি সে রকম কিছুই হবে না, বিশ্রী লাগবে শেষ পর্যন্ত।

চেয়ারের পিছনে সরিয়া গিয়া প্রভা ভূপেনের কাঁধে দুটি হাত রাখে। আমি ভাবছি, বিয়েতে কাজ নেই। অত ধরাবাঁধার মধ্যে আমরা যেতে পাবব না। তার চেয়ে বরং—

তাও আমরা পারব না প্রভা।

কপালে হাত রাখিয়া ভূপেনের মাথা নিজেব শবীবে চাপিযা বাখিযা প্রভা অনেকক্ষণ তেমনইভাবে দাঁড়াইয়া রহিল। তারপব অতি ক্লান্ত অতি মৃদু স্বরে বলিল, তা জানি। কিন্তু থাকতে পারছ না বলে তুমি যে পাগলামি শুরু করে দিয়েছিলে আবার কী ঝোঁক চাপবে তোমাব কে জানে। তার চেয়ে সব কিছুই ভালো।

আর পাগলামি করব না প্রভা।

কানের কাছে মুখ নামাইয়া প্রভা ফিসফিস কবিয়া বলিল, শোনো। তোমায় জানিয়ে রাখি। আজ থেকে আমি তোমার হয়ে রইলাম। যেদিন খুশি, যখন খুশি, আমাকে চাইলেই পাবে। বাত দুটোব সময় তুমি যদি আমায় ফোন করে ডাকো, ট্যাক্সি না পাই পাযে হেঁটে আমি তোমাব কাছে চলে যাব। তুমি কিন্তু শান্ত হযে থাকবে, নিজেকে ধ্বংস করতে পাববে না। কেমন ?

ছয়

জীবনে যতদিন স্বাদ-গন্ধ থাকে, মানুষের মনে হয় জীবনকে সে আয়ত্ত করিয়াছে, জীবন-কাব্যের সেই কবি। যে রকম স্বাদ-গন্ধই থাক, কটু অথবা মধুর, পাঁকের অথবা গোলাপের। স্বাদ-গন্ধ যখন উবিয়া যায়, প্রত্যাশা অথবা বিস্ময়ের দিন হয় শেষ, তখন মানুষের খেয়াল হয় জীবন তার অধিকারের বাহিরে, নিজের জীবনে নিজে সে কিছুই নয়।

প্রভার সঙ্গে শেষ বুঝাপড়া হইয়া গিয়াছে। বুঝিবার বা বুঝাইবার আর কিছুই বাকি নাই। স্বপ্ন আর কল্পনা সৃষ্টির কারখানায় বিচিত্র উপাদান সর্ববারের খেলা পরামর্শ করিয়া দুজনে বন্ধ করিয়া দিয়াছে। অনির্দিষ্ট লক্ষ্য সম্ভাবনাকে ছাঁটিয়া ফেলিযা দাঁড় করানো হইয়াছে একটি মাত্র বাস্তব ও নির্দিষ্ট সম্ভাবনায়। যেদিন খুশি, যখন খুশি, চাহিলেই প্রভাকে পাওয়া যাইবে। চাহিবার সংকোচ জয় করিতে হইবে না, না পাওয়ার ভয়ে কাতর হইতে হইবে না, প্রতীক্ষায় অধীর হইতে হইবে না, কোনো

আয়োজন করিতে হইবে না। এখন শুধু আছে চাওয়া এবং পাওয়া। তাছাড়া সমস্তই বাহুল্য, অনাবশ্যক। দুজনের মধ্যে সব ব্যবধান সংক্ষিপ্ত হইয়া গিয়াছে। চারিদিকে ছড়ানো দিগন্তের যেদিকে খুশি মুখ করিয়া রওনা হওয়া, কাছে আসা আর দূরে যাওয়া, পথ ভোলা আর পথ খোঁজা, নদী মাঠ বন উপবন সাগর ও পাহাড় পার হওয়া, এ সবের আর প্রয়োজন নাই, তার আর প্রভাব মধ্যে সোজা লাইন পাতা হইয়া গিয়াছে।

ভূপেন ভাবিতেও পারে নাই, এত সব রোমাঞ্চকর সম্ভাবনার এমন ভোঁতা পরিণতি হইবে। তার জানাও ছিল না প্রেম বাড়ে কমে, বাঁচে মরে। সেদিন প্রভার কাছে বিদায় লইয়া চলিয়া আসিবার সময়ও সে কিছু টের পায় নাই। একটা গুরুতর জটিল সমস্যার অতি সহজ ও সুন্দর মীমাংসা হইয়া গিয়াছে ভাবিয়া তখন কেবল নিশ্চিন্ত হওয়ার শান্তিই সে অনুভব করিয়াছিল। সেই সঙ্গে ছিল প্রভার সঙ্গে সমস্ত বিরোধের অবসান ও সর্বাঙ্গীণ বুঝাপড়ার আনন্দ। শান্ত মধুর এক অনির্বচনীয় পুলকের মধ্যে কয়েকটা দিন তার কাটিয়া গিয়াছিল, মনে হইয়াছিল পৃথিবী কী সুন্দর, গৃহ কী মনোরম, বাঁচিয়া থাকা কী সুখের। তারপর শীতল জলে স্নানের প্রভাবের মতো কীভাবে যেন উবিয়া যাইতে লাগিল সেই অস্থায়ী আবেশ, ধীরে ধীরে মিথ্যা হইয়া যাইতে লাগিল সাময়িক সত্য। রসালো দিনগুলি হইয়া উঠিল নীরস দীর্ঘ সময়। পাখা মেলিয়া উড়িতে উড়িতে এক সময় তার আকাশটি পর্যন্ত রহিল না, পাখা গুটাইয়া ভারাক্রান্ত দেহে অবসন্ন মনে নামিয়া আসিতে হইল পাথর ঢাকা মাটির প্রলেপ বিছানো কাঁকরে।

ভূপেনের মানসিক স্থবিরত্বের সুযোগে সংসার ধীরে ধীরে তার মনোযোগ নিজের দিকে টানিয়া লইতে লাগিল। এতদিন সংসারের কোনো বিষয়ে কেউ কিছু বলিতে আসিলেই ভূপেন বিরক্ত হইয়া উঠিতেছিল, এখন ছোটোবড়ো সব বিষয়েই তার পরামর্শ ও নির্দেশ পাওয়া যাইতে লাগিল। স্বর্ণের সাহস সকলের চেয়ে বেশি, সংসার পরিচালনার দায়িত্বটাও তার, ভয়ে ভয়ে সেই প্রথমে দুটি-একটি সমস্যা তার দপ্তরে হাজির করিতে লাগিল। তারপর জানাজানি হইয়া গেল মেজাজ ভূপেনের ঠান্ডা হইয়া গিয়াছে, কথায় কথায় অকারণে সে আর চটিয়া উঠে না। তখন সাহস পাইয়া সকলে ঘেঁষিয়া আসিল তার কাছে, জানাইতে লাগিল অসংখ্য দাবি ও প্রার্থনা। ভীরু রমলা পর্যন্ত স্বর্ণের রায়ের বিরুদ্ধে তার কাছে আপিল পেশ করিতে গেল, তার গান শেখার বিশেষ ব্যবস্থা করিয়া না দিলে সে কিন্তু প্রয়োপবেশন আরম্ভ করিবে, হ্যাঁ।

বাঁধভাঙা বন্যার মতো স্থগিত করা দায়িত্ব ও কর্তব্য ভূপেনকে ভাসাইয়া নেওয়ার উপক্রম করিল। কত কী যে তাকে করিতে হইবে তার ঠিক ঠিকানা নাই। পিসির বড়ো মেয়েটার বিবাহ না দিলে নয়, পুরী যাওয়ার জন্য মা উতলা হইয়া পড়িয়াছেন, নৃপেন ম্যাট্রিক পাশ করিয়া এবার কোন কলেজে কী পড়িবে ঠিক করা দরকার, বিমলার ফিটের অসুখের বাড়াবাড়ি শুরু হইয়াছে, ভালো চিকিৎসার ব্যবস্থা করা উচিত, বাড়ির প্রায় সকলের জন্য জামাকাপড় কিনিতে এ মাসে বেশি টাকার দরকার, দু-বছর বাড়ির কলি ফিরানো হয় নাই, মন্টুর গায়ে ফোড়া উঠিয়াছে, খুকি সর্বদা নখ কামড়ায়, আরও কত কী।

আগে এ সব সরমার মারফতে তার কাছে পৌঁছিত, এতটুকু ব্যস্ততা বা উদ্‌বেগ সরমার দেখা যাইত না, ধীরে-সুস্থে একে-একে সমস্ত দরকারি-অ-দরকারি খবরগুলি তাকে শুনাইয়া যাইত, যেখানে ব্যাখ্যা প্রয়োজন নিজেই ব্যাখ্যা করিত। কোন বিষয়ের গুরুত্ব কতখানি নিজে নিজে স্থির করিবার কী আশ্চর্য ক্ষমতা সরমার ছিল! শুধু তার বলিবার ধরনেই সব বিষয়ে ভূপেনেরও স্পষ্ট ধারণা জন্মিয়া যাইত, মনে হইত কিছু না বলিয়াও সরমাই যেন তাকে বলিয়া দিয়াছে কোন বিষয়ে কী তার কী করা উচিত। এখন সোজাসুজি সংসারের বহুমুখী জটিলতার সংস্পর্শে আসিয়া মাঝে মাঝে ভূপেনের ধাঁধা লাগিয়া যায়, নিজেকে অসহায় মনে হয়। সরমার জন্য তখন মন কেমন করিতে থাকে। সরমা

থাকিলে আজ তার ভাবনা ছিল না। সমস্ত জটিলতা সরমা সরল করিয়া দিত, বসিয়া বসিয়া তার মাথা ঘামানোর প্রয়োজন হইত না।

যে সব ব্যাপারে কর্তব্য ঠিক করিতে তার এত ভাবিতে হয়, ভাবিয়া ভাবিয়া সিদ্ধান্ত করার পরেও দ্বিধা সন্দেহে মন ভরিয়া থাকে, সরমা কেমন করিয়া সে সব ব্যাপারের মূল কথাটি এত সহজে ধরিতে পারিত ? নিজেদের প্যাঁচালো বুদ্ধিতে জটিল যুক্তিতর্ক খাড়া করিয়া তারা যে বিষয় ঘোরালো করিয়া তোলে সরমার মতো মেয়েদের সহজ বুদ্ধিতে বোধ হয় সে সব সহজভাবেই ধরা পড়ে।

অনেক মেয়ের হয়তো এই স্বাভাবিক ক্ষমতা আছে। যেমন শান্তি। বাঙালি পরিবার যেমন এক ছাঁচে ঢালা তাতে শান্তি ও সরমা একই আবেষ্টনীতে মানুষ হইয়াছে মনে করা চলে। সরমার মতো সেও হয়তো পাইয়াছে সহজ সরল বুদ্ধি। তবে সরমার অভিজ্ঞতা তার নাই, স্বামী-পুত্র আর স্বামীর আত্মীয়-পরিজনের বৃহৎ সংসারে কয়েকটা বছর কাটানোর আগে সে সব বেচারি পাইবেই বা কোথায়। বিবাহের সময় সরমা যেমন ছিল, লাজুক আর দিশেহারা, ও এখন সেই স্তরে আছে। সরমার মতো হইয়া উঠিতে ওর অনেক সময় লাগিবে, অনেক।

কাজ আর সংসারের দায়িত্ব আশ্রয় করিয়া ভূপেন নিজেকে ভুলিবার চেষ্টা করে এবং এত সহজে নিজেকে ভোলা যায় দেখিয়া আশ্চর্য হইয়া যায়। সে বুঝিতে পারে মূল্য দিলেই জগতের তুচ্ছ অবলম্বনও মূল্যবান হইয়া উঠিতে পারে। বিয়াল্লিশ বছর বয়সে নিজের বাড়ির মানুষগুলি সম্বন্ধে সে এক নূতন সত্য আবিষ্কার করে, বিভিন্ন স্বার্থ আর প্রকৃতি কতটুকু মমতাকে আশ্রয় করিয়া সামঞ্জস্য বজায় রাখিতে পারে। হিংসা-বিদ্বেষ, কলহ-বিবাদ ওই সামান্য প্রীতির বাঁধনটুকু ছিঁড়িতে পারে না, কলহের শেষে আবার অনায়াসে গলাগলি ভাব হয়। এটা সম্ভব হয় শুধু বাস্তবতার ভিত্তিতে তাদের সম্পর্ক দাঁড়াইয়া আছে বলিয়া। ছাড়াছাড়ি হওয়াটা তাদের কাছে মর্মান্তিক কিছু নয়, তবু ছাড়াছাড়ি হয় না। কারণ তার প্রয়োজন নাই। প্রয়োজন যতক্ষণ না আসে ততক্ষণ মিলিয়া মিশিয়া আনন্দেই সকলে দিন কাটায় !

এভাবে জীবন কাটাইতে দোষ কী ? কারও সঙ্গে এমন সম্পর্ক গড়িয়া তোলার প্রয়োজন কী, যে সম্পর্ক চুকিয়া গেলে বাঁচিয়া থাকাটাই ভয়াবহ শাস্তিতে পরিণত হয় ?

যত দিন যায়, প্রভার বিরুদ্ধে একটা জোরালো অভিযোগ ভূপেনের মনে স্পষ্ট হইয়া উঠিতে থাকে। দুজনের সম্পর্ক সহজ করিয়া দেওয়ায় প্রথমে প্রভার কাছে তার কৃতজ্ঞতার সীমা ছিল না, তারপর ভীরু সন্দেহের মতো ক্ষীণ একটা প্রতিবাদ মনে জাগিয়াছিল যে প্রভা কি সত্যই খুব বেশি উদারতা দেখাইয়াছে ? হতাশ অবসন্নতার ভাব কাটিয়া যাওয়ার সঙ্গে জীবনের অপার শূন্যতা পীড়ন আরম্ভ করিলে এই প্রতিবাদের ভাষা ক্রমে ক্রমে প্রবল হইয়া উঠিয়াছে। কেবলই মনে হইতেছে, তার দিক ভাবিয়া তো শুধু নয়, নিজেকে মুক্তি দেওয়ার জন্য প্রভা তাকে মুক্তি দিয়াছে। প্রভা রেহাই চাহিয়াছিল। এমন অন্ধ আবেগের সঙ্গে রেহাই চাহিয়াছিল যে, ভবিষ্যৎ পুনরাবৃত্তির সম্ভাবনা পর্যন্ত ঘুচাইয়া দিয়া তাদের ভালোবাসাকে সে চিরদিনের জন্য ধ্বংস করিয়া দিয়াছে ! প্রভা জানে বাসন্তী পূর্ণিমা রাত্রের অনির্দিষ্ট কামনা তার নয়, প্রতিদিন সে তাকে চায় জীবনের সুখ-দুঃখ হাসি-কান্নার সাথি হিসাবে। জানিয়া শুনিয়া এ উদারতা দেখানোর কী মানে হয়, আমাকে চাহিলেই তুমি পাইবে ! কী করিয়া প্রভা মনে করিতে পারিল ওভাবে সে তাকে কোনোদিন চাহিতে পারে ?

সমস্ত কী ছল প্রভার, তাকে ঘিরিয়া স্বপ্ন রচনার সেই কথা ? স্বপ্ন কী প্রভা রচনা করিতে জানে ? তাকে সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য হয়তো প্রভা ও কথা বলিয়াছে। অনেকদিনের বন্ধু সে, অনেকদিন হইতে তার প্রেমে উন্মাদ, সুতরাং উদারভাবে তাকে কতগুলি রোমাঞ্চকর কথা তো অন্তত বলা উচিত, নিজেকে যখন দেওয়া চলে না ! একটু শান্ত করা উচিত মানুষটার মন, তার জন্যই

মন যখন তার এত উতলা হইয়াছে ! প্রভা ডাক্তার, রোগীকে সে ওষুধ দেয়, আশা দেয়, তারও প্রেমোন্মাদনার চিকিৎসাই হয়তো প্রভা করিয়াছে।

চাহিলেই আমাকে পাইবে, এ কথাও হয়তো প্রভাব মিথ্যা। সে কোনোদিন চাহিবে না জানিয়াই ও কথা প্রভা বলিতে পারিয়াছে।

ভাবিতে ভাবিতে একদিন প্রভাকে আঘাত করিবার দুরন্ত ইচ্ছা জাগে ভূপেনের, কোনোমতে এ ইচ্ছা সে দমন করিতে পারে না। প্রভার মিথ্যা ধবাইয়া দিতে হইবে, বুঝাইযা দিতে হইবে ছেলেভুলানো কথায় ভুলিয়া থাকিবার মানুষ সে নয। প্রভাকে এ ভাবে জব্দ করিয়া তার লাভ কী হইবে ভাবিয়া দেখিবার অবসর ভূপেন পায় না, ঝোঁকের মাথায় সন্ধ্যার পর সে প্রভার বাড়ি যাওয়ার জন্য বাহির হইয়া পড়ে। মন তাব ভরিয়া থাকে গভীর বিষাদে কিন্তু প্রত্যাবর্তনের কথা সে ভাবে না।

সারাদিনের গবমের পর এখন পরম উপভোগ্য বাতাস বহিতে শুরু করিয়াছে। ভূপেন হাঁটিয়াই প্রভাব বাড়িব দিকে চলিতে থাকে। তাড়াতাড়ি করিবার কিছু নাই, উৎকণ্ঠিত আগ্রহে প্রতীক্ষা তো কেউ করিতেছে না তার জন্য। ফিবিয়া তার আসিতে হইবে, দু-দণ্ডেব জন্য বিব্রত প্রভার মুখখানি দেখিয়া, প্রভার মনকে শেষ জানা জানিয়া।

বাহিরের বসিবাব ঘরে কেউ ছিল না, একটি স্তিমিত আলো জ্বলিতেছে। উপর হইতে কয়েকটি মানুষের কথা ও হাসি ভাসিযা আসিতেছিল। ভূপেন একটা খালি চেয়ারে বসিয়া পড়িল। প্রভার কয়েকটি বন্ধু আসিযাছে, দোতলায় প্রভাব ঘরে তারা সানন্দে কলরব করিতেছে। প্রভার গলা শোনা গেল, কথাগুলি বুঝিতে পারা গেল না, তার কানে আসিল প্রভার উচ্ছ্বসিত হাসিব শব্দ। এখনও সে হাসিতে ভুলিয়া যায় নাই। জীবন যাদের আনন্দে ভরপুর, ভিতরের হাসি যাদের শব্দে ফাটিয়া পড়ার জন্য সর্বদা উদ্যত হইযা আছে, তাদেব সঙ্গে মিলিযা মিশিয়া সন্ধ্যাটি প্রভা উপভোগ করিতেছে।

ভূপেন ঈর্ষা বোধ করে না, সে শুধু আশ্চর্য হইয়া যায়। প্রভার জীবনেও হাসি ও আনন্দ আজ এত সুলভ ! নিজে সে তবে হাসিতে ভুলিয়া গিযাছে কেন ? এ দোষ তো তার নিজের। প্রেমকে এত বড়ো করিয়া তুলিবার কোনো প্রয়োজন তো তার ছিল না, ব্যর্থতাকে আঁকড়াইযা ধরিযা থাকিতে কেউ তো তাকে অনুরোধ করে নাই। সরমা আব নন্তুব জন্য শোক যদি তার হইয়া থাকে, হোক, প্রভা যদি স্বপ্ন আর কল্পনাব জগৎকে অনুর্বর মরুভূমি করিযা দিয়া থাকে, দিক। আবও তো অনেক কিছু আছে জীবনে, সে সব অস্বীকার করিবার কোনো কারণ তো নাই। হাতের খেলনা কাড়িয়া নেওয়া হইযাছে বলিয়া অবোধ শিশু ঘবেব আসবাব ভাঙিতে আরম্ভ করে। সে তো শিশু নয়।

প্রভাব সঙ্গে আবাব আর একটা বুঝাপড়ার মতলব ভূপেনেব কাছে হাস্যকব ছেলেমানুষি হইযা যায়, কী হইবে প্রমাণ কবিয়া প্রভাব মনে কী ছিল আর কী ছিল না ? তাব চেয়ে প্রভাকে হাসিতে দেওযাই ভালো।

দোকানীর বৌ

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়

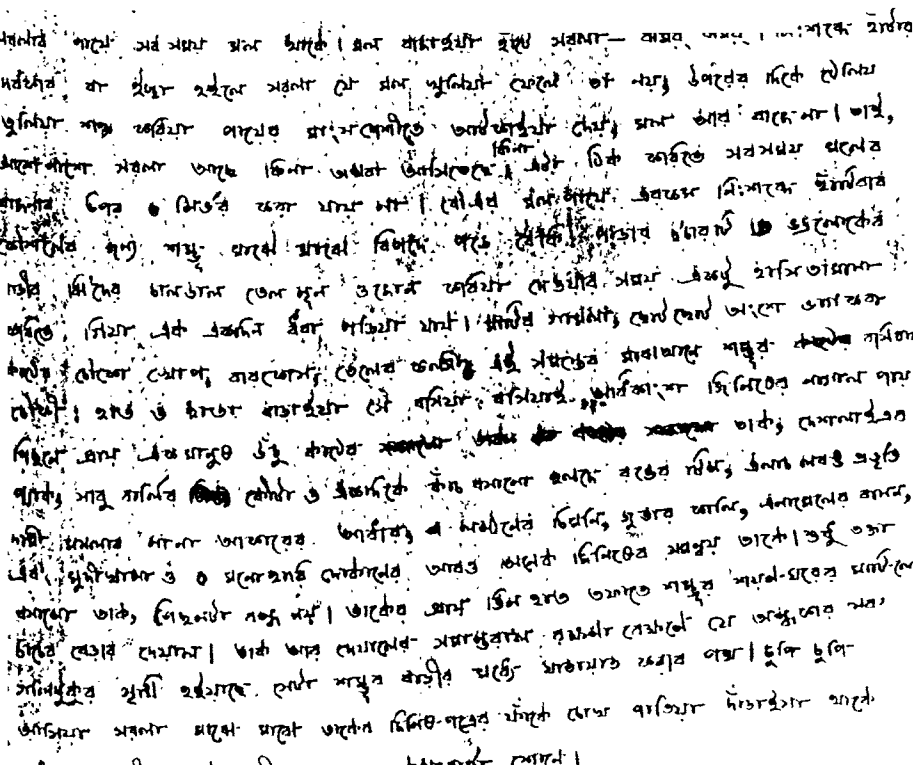

দোকানীর বৌ গল্পের পাণ্ডুলিপির পৃষ্ঠা